তৃতীয় অধ্যায়

কর্মযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন ।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; জ্যায়সী—শ্রেয়তর; চেৎ—যদি; কর্মণঃ—সকাম কর্ম অপেক্ষা; তে—তোমার; মতা—মতে; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; জনার্দন—হে শ্রীকৃষ্ণ; তৎ—তা হলে; কিম্—কেন; কর্মণি—কর্মে; ঘোরে—ভয়ানক; মাম্—আমাকে; নিয়োজয়সি—নিযুক্ত করছ; কেশব—হে শ্রীকৃষ্ণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

যদি বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ ওহে জনার্দন ।
ঘোর যুদ্ধে নিয়োজিত কর কি কারণ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা ভক্তি-বিষয়িনী বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, তা হলে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কেন আমাকে প্ররোচিত করছ?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে জড় জগতের দুঃখার্ণব থেকে উদ্ধার করবার জন্য আত্মার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন—সেই পথ হচ্ছে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনা। কখনও কখনও এই বুদ্ধিযোগের কদর্থ করে একদল নিষ্কর্মা লোক কর্ম-বিমুখতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষ্ণভাবনার নাম করে তারা নির্জনে বসে কেবল হরিনাম জপ করেই কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার দুরাশা করে। কিন্তু যথাযথভাবে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা লাভ না করে নির্জনে বসে কৃষ্ণনাম জপ করলে নিরীহ, অজ্ঞ লোকের সস্তা বাহবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় না। অর্জুনও প্রথমে বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগকে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার নামান্তর বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন, নির্জন অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধনা ও তপশ্চর্যার জীবনযাপন করবেন। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণভাবনার অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান শিষ্যের মতো যখন তিনি তাঁর গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁকে কর্মযোগ বা কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে শোনান।

শ্লোক ২

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্রেণ—দ্ব্যর্থবোধক; **ইব**—যেন; **বাক্যেন**—বাক্যের দ্বারা; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **মোহয়সি**—মোহিত করছ; **ইব**—মতো; **মে**—আমার; **তৎ**—অতএব; **একম্**—একমাত্র; **বদ**—দয়া করে বল; **নিশ্চিত্য**—নিশ্চিতভাবে; **যেন**—যার দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—প্রকৃত কল্যাণ; **অহম্**—আমি; **আপ্নুয়াম্**—লাভ করতে পারি।

গীতার গান

দ্ব্যর্থক কথায় বুদ্ধি মোহিত যে হয় ।
নিশ্চিত যা হয় কহ শ্রেয় উপজয় ॥

অনুবাদ

তুমি যেন দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করছ। তাই, দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে বল কোন্‌টি আমার পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয়স্কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতার ভূমিকাস্বরূপ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ, বুদ্ধিযোগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, নিষ্কাম কর্ম, কনিষ্ঠ ভক্তের স্থিতি আদি বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি সবই অসম্বদ্ধভাবে পরিবেশিত হয়েছিল। কর্মোদ্যোগ গ্রহণ এবং উপলব্ধির জন্য যথাযথ পন্থা-প্রণালী সম্পর্কিত বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত নির্দেশাবলী একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, ভগবানেরই ইচ্ছার ফলে অর্জুন সাধারণ মানুষের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন, যাতে সাধারণ মোহাচ্ছন্ন মানুষেরাও ভগবানের উপদেশাত্মক বাণীর যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। ভগবৎ-তত্ত্বের যথার্থ অর্থ না বুঝতে পেরে অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কুতার্কিকদের মতো কথার জাল বিস্তার করে ভগবান অর্জুনকে বিভ্রান্ত করতে চাননি। নিষ্ক্রিয়তা অথবা সক্রিয় সেবা—কোনভাবেই অর্জুন কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অনুসরণ করতে পারছিলেন না। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনাময় পথ সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যে ভগবানের অনুপ্রেরণায় অর্জুন নানা রকম প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যাতে *ভগবদ্‌গীতার* রহস্য উপলব্ধি করার জন্য যাঁরা গভীরভাবে আগ্রহী, তাঁদের সুবিধা হয়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **দ্বিবিধা**—দুই প্রকার; **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা; **পুরা**—ইতিপূর্বে; **প্রোক্তা**—উক্ত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **জ্ঞানযোগেন**—জ্ঞানযোগের দ্বারা; **সাংখ্যানাম্**—অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিকদের; **কর্মযোগেন**—ভগবানে অর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা; **যোগিনাম্**—ভক্তদের।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

দ্বিবিধ লোকের নিষ্ঠা বলেছি তোমারে ।
সাংখ্য আর জ্ঞানযোগ যোগ্য অধিকারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে নিষ্পাপ অর্জুন! আমি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, দুই প্রকার মানুষ আত্ম-উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। কিছু লোক অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক জ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান এবং অন্যেরা আবার তা ভক্তির মাধ্যমে জানতে চান।

তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯তম শ্লোকে ভগবান সাংখ্য-যোগ ও কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ—এই দুটি পন্থার ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্লোকে ভগবান তারই বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য-যোগ চেতন ও জড়ের প্রকৃতির বিশ্লেষণমূলক বিষয়বস্তু। যে সমস্ত মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে চায়, তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই সাংখ্য-যোগ। অন্য পন্থাটি হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা বা বুদ্ধিযোগ, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবান ৩৯তম শ্লোকেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই বুদ্ধিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করলে অতি সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অধিকন্তু এই পন্থায় কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ৬১তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করাই হচ্ছে বুদ্ধিযোগ এবং তার ফলে দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই সংযত হয়। তাই, এই দুটি যোগই ধর্ম ও দর্শনরূপে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। দর্শনবিহীন ধর্ম হচ্ছে ভাবপ্রবণতা বা অন্ধ গোঁড়ামি, আর ধর্মবিহীন দর্শন হচ্ছে মানসিক জল্পনা-কল্পনা। অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ যে সমস্ত দার্শনিকেরা বা জ্ঞানীরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পরম সত্যকে জানবার সাধনা করছেন, তাঁরাও অবশেষে কৃষ্ণভাবনায় এসে উপনীত হন। *ভগবদ্গীতায়ও* এই কথা বলা হয়েছে। সমগ্র পন্থাটি হচ্ছে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা। পরোক্ষ পন্থাটি হচ্ছে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা, যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে সে কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে উপনীত হতে পারে; আর অন্য পন্থাটি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য, পরমেশ্বর বলে উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে

আমাদের সনাতন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করা। এই দুটির মধ্যে কৃষ্ণভাবনার পন্থাই শ্রেয়, কেন না এই পন্থা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গুলির শুদ্ধিকরণের উপর নির্ভরশীল নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত স্বয়ং শুদ্ধিকরণের পন্থা এবং কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অন্তরকে কলুষমুক্ত করে। ভক্তি নিবেদনের প্রত্যক্ষ পন্থারূপে এই পথ সহজ ও উচ্চস্তরের।

শ্লোক ৪

ন কর্মণামনারম্ভান্ নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে ।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

ন—না; **কর্মণাম্**—শাস্ত্রীয় কর্মের; **অনারম্ভাৎ**—অনুষ্ঠান না করে; **নৈষ্কর্ম্যম্**—কর্মফল থেকে মুক্তি; **পুরুষঃ**—মানুষ; **অশ্নুতে**—লাভ করে; **ন**—না; **চ**—ও; **সন্ন্যসনাৎ**—কর্মত্যাগের দ্বারা; **এব**—কেবল; **সিদ্ধিম্**—সাফল্য; **সমধিগচ্ছতি**—লাভ করে।

গীতার গান

বিহিত কর্মের নিষ্ঠা না করি আরম্ভ ।
নৈষ্কর্ম জ্ঞান যে চর্চা হয় এক দম্ভ ॥
বিহিত কর্মের ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি নয় ।
কেবল সন্ন্যাসে কার্যসিদ্ধি নাহি হয় ॥

অনুবাদ

কেবল কর্মের অনুষ্ঠান না করার মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আবার কর্মত্যাগের মাধ্যমেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী বিধি-নিষেধের আচরণ করার ফলে যখন অন্তর পবিত্র হয় এবং জড় বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে যায়, তখন মানুষ সর্বত্যাগী জীবনধারায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করার যোগ্য হয়। অন্তর পবিত্র না হলে—সম্পূর্ণভাবে কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত না হলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন মানেই হয় না। মায়াবাদী জ্ঞানীরা মনে করে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্রই অথবা সকাম কর্ম পরিহার করা মাত্রই তারা তৎক্ষণাৎ নারায়ণের মতো ভগবান হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

কিন্তু তা অনুমোদন করছেন না। অন্তর পবিত্র না করে, জড় বন্ধন মুক্ত না হয়ে সন্ন্যাস নিলে, তা কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাতেরই সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, যদি কেউ ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তবে তাঁর বর্ণ ও আশ্রমজনিত ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, ভগবান নিজেই সেই কথা বলেছেন। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। এই ধর্মের স্বল্প আচরণ করলেও জড় জগতের মহাভয় থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়।

শ্লোক ৫

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

ন—না; **হি**—অবশ্যই; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ক্ষণম্**—ক্ষণ মাত্রও; **অপি**—ও; **জাতু**—কখনও; **তিষ্ঠতি**—থাকতে পারে; **অকর্মকৃৎ**—কর্ম না করে; **কার্যতে**—করতে বাধ্য হয়; **হি**—অবশ্যই; **অবশঃ**—অসহায়ভাবে; **কর্ম**—কর্ম; **সর্বঃ**—সকলে; **প্রকৃতিজৈঃ**—প্রকৃতিজাত; **গুণৈঃ**—গুণসমূহের দ্বারা।

গীতার গান

ক্ষণেক সময় মাত্র না করিয়া কর্ম ।
থাকিতে পারে না কেহ স্বাভাবিক ধর্ম ॥
প্রকৃতির গুণ যথা সবার নির্বন্ধ ।
সেই কার্য করে যাতে করমের বন্ধ ॥

অনুবাদ

সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়; তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

কর্তব্যকর্ম না করে কেউই থাকতে পারে না। আত্মার ধর্মই হচ্ছে সর্বক্ষণ কর্মরত থাকা। আত্মার উপস্থিতি না থাকলে জড় দেহ চলাফেরা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে জড় দেহটি একটি নিষ্প্রাণ গাড়ি মাত্র, কিন্তু সেই দেহে অবস্থান করে আত্মা সর্বক্ষণ তাকে সক্রিয় রাখার কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে এবং এই কর্তব্যকর্ম

থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হতে পারে না। সেই হেতু, জীবাত্মাকে কৃষ্ণভাবনার মঙ্গলময় কর্মে নিয়োজিত করতে হয়, তা না হলে মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীবাত্মা অনিত্য জড়-জাগতিক কর্মে ব্যাপৃত থাকে। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আত্মা জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তাই এই জড় গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হবার জন্য শাস্ত্র-নির্ধারিত কর্মের আচরণ করতে হয়। কিন্তু আত্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত হয়, তখন সে যা করে, তার পক্ষে তা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৫/১৭) বলা হয়েছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি ।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥

"যদি কেউ কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করে এবং তখন সে যদি শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না মেনেও চলে অথবা তার স্বধর্ম পালনও না করে, এমন কি সে যদি অধঃপতিত হয়, তা হলেও তার কোন রকম ক্ষতি বা অমঙ্গল হয় না। কিন্তু সে যদি পবিত্র হবার জন্য শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত আচার-আচরণ পালনও করে, তাতে তার কি লাভ, যদি সে কৃষ্ণভাবনাময় না হয়?" সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার জন্যই শুদ্ধিকরণের পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই, সন্ন্যাস আশ্রমের অথবা যে-কোন চিত্তশুদ্ধি করণ পন্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করা। তা না হলে সব কিছুই নিরর্থক।

শ্লোক ৬

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি—পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়; **সংযম্য**—সংযত করে; **যঃ**—যে; **আস্তে**—অবস্থান করে; **মনসা**—মনের দ্বারা; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ইন্দ্রিয়ার্থান্**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **বিমূঢ়**—মূঢ়; **আত্মা**—আত্মা; **মিথ্যাচারঃ**—কপটাচার; **সঃ**—তাকে; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

কর্মেন্দ্রিয় রোধ করি মনেতে স্মরণ ।
ইহা নাহি চিত্তশুদ্ধি নৈষ্কর্ম কারণ ॥
অতএব সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা হয় ।
ইন্দ্রিয়ার্থ মিথ্যাচারী শাস্ত্রেতে কহয় ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই মূঢ় অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অনেক মিথ্যাচারী আছে, যারা কৃষ্ণভাবনাময় সেবাকার্য করতে চায় না, কেবল ধ্যান করার ভান করে। কিন্তু এতে কোন কাজ হয় না। কারণ, তারা তাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে রোধ করলেও মন তাদের সংযত হয় না। পক্ষান্তরে, মন অত্যন্ত তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখের জল্পনা-কল্পনা করতে থাকে। তারা লোক ঠকানোর জন্য দুই-একটি তত্ত্বকথাও বলে। কিন্তু এই শ্লোকে আমরা জানতে পারছি যে, তারা হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রতারক। বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ করেও মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে মানুষ যখন তার স্বধর্ম পালন করে, তখন ক্রমে ক্রমে তার চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি যোগী সেজে লোক ঠকায়, সে আসলে ত্যাগীর বেশ ধারণ করে ভোগের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের প্রতারক। মাঝে মাঝে দুই-একটি তত্ত্বকথা বলে সরলচিত্ত সাধারণ মানুষের কাছে তার তত্ত্বজ্ঞান জাহির করতে চায়, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, সেগুলি তোতাপাখির মতো মুখস্থ করা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে ঐ ধরনের পাপাচারী প্রতারকদের সমস্ত জ্ঞান অপহরণ করে নেন। এই প্রকার প্রতারকের মন সর্বদাই অপবিত্র এবং সেই জন্য তার তথাকথিত লোকদেখানো ধ্যান নিরর্থক।

শ্লোক ৭

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন ।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

যঃ—যিনি; **তু**—কিন্তু; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনসা**—মনের দ্বারা; **নিয়ম্য**—সংযত করে; **আরভতে**—আরম্ভ করেন; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ**—কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **কর্মযোগম্**—কর্মযোগ; **অসক্তঃ**—আসক্তি রহিত; **সঃ**—তিনি; **বিশিষ্যতে**—বিশিষ্ট হন।

গীতার গান

কিন্তু যদি নিজেন্দ্রিয় সংযত নিয়মে ।
কর্মের আরম্ভ করে যথা যথা ক্রমে ॥
বাতুল না হয় মর্কট বৈরাগ্য করি ।
অন্তর্নিষ্ঠা হলে হয় সহায় শ্রীহরি ॥
সেই হয় কর্মযোগ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ।
আসক্তিরহিত কর্ম বিশেষ প্রকারা ॥

অনুবাদ

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে অনাসক্তভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

তাৎপর্য

সাধুর বেশ ধরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও ভোগতৃপ্তির জন্য লোক ঠকানোর চাইতে স্বকর্মে নিযুক্ত থেকে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করা শত-সহস্র গুণে ভাল। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। *স্বার্থগতি* অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় লাভ করা। সমগ্র বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সেই চরম গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম করার ফলে একজন গৃহস্থও ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। আত্ম-উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সংযত জীবনযাপন করে কেউ যখন কর্তব্যকর্ম করে, তখন আর তার কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকে না, কারণ সে তখন আসক্তিরহিত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহভাবে তার কর্তব্যকর্ম করে চলে। এভাবে সংযত ও নিঃস্পৃহ থাকার

ফলে তার অন্তর পবিত্র হয় এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়। অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতারণাকারী মর্কট বৈরাগী হবার চাইতে একজন ঐকান্তিক ব্যক্তি যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে অনেক উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। যে-সমস্ত ভণ্ড সাধু লোক ঠকাবার জন্য ধ্যান করার ভান করে, তাদের থেকে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ মেথরও অনেক মহৎ।

শ্লোক ৮

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

নিয়তম্—শাস্ত্রোক্ত; **কুরু**—কর; **কর্ম**—কর্ম; **ত্বম্**—তুমি; **কর্ম**—কাজ; **জ্যায়ঃ**—শ্রেয়; **হি**—অবশ্যই; **অকর্মণঃ**—কর্মত্যাগ অপেক্ষা; **শরীরযাত্রা**—দেহধারণ; **অপি**—এমন কি; **চ**—ও; **তে**—তোমার; **ন**—না; **প্রসিদ্ধ্যেৎ**—সিদ্ধ হয়; **অকর্মণঃ**—কর্ম না করে।

গীতার গান

নিয়মিত কর্ম ভাল সেই অকর্ম অপেক্ষা ।
অনধিকারীর কর্মত্যাগ, পরমুখাপেক্ষা ॥
শরীর নির্বাহ যার নহে কর্ম বিনা ।
কর্মত্যাগ তার পক্ষে হয় বিড়ম্বনা ॥

অনুবাদ

তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর, কেন না কর্মত্যাগ থেকে কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেয়। কর্ম না করে কেউ দেহযাত্রাও নির্বাহ করতে পারে না।

তাৎপর্য

অনেক ভণ্ড সাধু আছে, যারা জনসমক্ষে প্রচার করে বেড়ায় যে, তারা অত্যন্ত উচ্চ বংশজাত এবং কর্ম-জীবনেও তারা অনেক সাফল্য লাভ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য তারা সব কিছু ত্যাগ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই রকম ভণ্ড সাধু হতে নিষেধ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁকে শাস্ত্র-নির্ধারিত ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অর্জুন ছিলেন

গৃহস্থ ও সেনাপতি, তাই শাস্ত্র-নির্ধারিত গৃহস্থ-ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। এই ধর্ম পালন করার ফলে জড় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের হৃদয় পবিত্র হয় এবং ফলে সে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়। তথাকথিত ত্যাগীরা, যারা দেহ প্রতিপালন করবার জন্যই ত্যাগের অভিনয় করে, ভগবান তাদের কোন রকম স্বীকৃতি দেননি, শাস্ত্রেও তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এমন কি দেহ প্রতিপালন করবার জন্যও মানুষকে কর্ম করতে হয়। তাই, জড়-জাগতিক প্রবৃত্তিগুলিকে শুদ্ধ না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই জড় জগতে প্রত্যেকেরই অবশ্য জড়া প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার কলুষময় প্রবৃত্তি আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা আছে। সেই কলুষময় প্রবৃত্তিগুলিকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। শাস্ত্র-নির্দেশিত উপায়ে তা না করে, কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে এবং অন্যের সেবা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তথাকথিত অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী হবার চেষ্টা করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৯

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থাৎ—যজ্ঞ বা বিষ্ণুর জন্যই কেবল; **কর্মণঃ**—কর্ম; **অন্যত্র**—তা ছাড়া; **লোকঃ**—এই জগতে; **অয়ম্**—এই; **কর্মবন্ধনঃ**—কর্মবন্ধন; **তৎ**—তাঁর; **অর্থম্**—নিমিত্ত; **কর্ম**—কর্ম; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **মুক্তসঙ্গঃ**—আসক্তি রহিত হয়ে; **সমাচর**—অনুষ্ঠান কর।

গীতার গান

যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তোষ লাগিয়া ।
নিয়মিত কর্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া ॥
আর যত কর্ম হয় বন্ধের কারণ ।
অতএব সেই কার্য কর নিবারণ ॥
ভগবদ্ সন্তোষার্থ কর্মের প্রসঙ্গ ।
যত কিছু আচরণ সব মুক্ত সঙ্গ ॥

অনুবাদ

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্মই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ। তাই, হে কৌন্তেয়! ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর এবং এভাবেই তুমি সর্বদাই বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

তাৎপর্য

যেহেতু দেহ প্রতিপালন করবার জন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম করতে হয়, তাই সমাজের বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্ধারিত করা হয়েছে, যাতে তাদের উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে সাধিত হয়। যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানকে বোঝায়। তাই তাঁকে প্রীতি করার জন্যই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। *বেদে* বলা হয়েছে—*যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*। পক্ষান্তরে, নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ করা আর সরাসরিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবা করার দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান, কেন না এই শ্লোকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্যও হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। *বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ / বিষ্ণুরারাধ্যতে* (*বিষ্ণু পুরাণ* ৩/৮/৮)।

তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। এ ছাড়া আর সমস্ত কর্মই আমাদের এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। সেই কর্ম ভালই হোক আর খারাপই হোক, সেই কর্মের ফল অনুষ্ঠাতাকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাই, শ্রীকৃষ্ণকে (অথবা শ্রীবিষ্ণুকে) সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কর্ম করতে হয়। এভাবেই যে ভগবানের সেবাপরায়ণ হয়েছে, সে আর কখনও জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয় না—মুক্ত স্তরে বিরাজিত। এটিই হচ্ছে কর্ম সম্পাদনের মহৎ কৌশল এবং এই পন্থার শুরুর প্রারম্ভে দক্ষ পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে অথবা স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বাবধানে (যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে অর্জুন করেছিলেন) গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই যোগ সাধন করতে হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কিছুই করা উচিত নয়, বরং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা উচিত। এভাবেই অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকেই মুক্ত থাকা যায়, তাই নয়—তা ছাড়া ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তির স্তরে ক্রমশ উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে তাঁর সচ্চিদানন্দময় পরম ধামে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়।

শ্লোক ১০

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

সহ—সহ; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞাদি; **প্রজাঃ**—প্রজাসকল; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **পুরা**—পুরাকালে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **প্রজাপতিঃ**—সৃষ্টিকর্তা; **অনেন**—এর দ্বারা; **প্রসবিষ্যধ্বম্**—উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও; **এষঃ**—এই সকল; **বঃ**—তোমাদের; **অস্তু**—হোক; **ইষ্ট**—সমস্ত অভীষ্ট; **কামধুক্**—প্রদানকারী।

গীতার গান

প্রজাপতি সৃষ্টি করি যজ্ঞের সাধন ।
উপদেশ করেছিল শুনে প্রজাগণ ॥
যজ্ঞের সাধন করি সুখী হও সবে ।
যজ্ঞদ্বারা ভোগ পাবে ইন্দ্রিয় বৈভবে ॥

অনুবাদ

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা যজ্ঞাদি সহ প্রজাসকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন—"এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করবে।"

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে মায়াবদ্ধ জীবদের ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই জীবসকল এই জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়ে জড় বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। *বেদের* বাণী আমাদের এই শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। ভগবান বলছেন যে, *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে—*পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্*। তাই, সমস্ত জীবের ঈশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (২/৪/২০) শ্রীশুকদেব গোস্বামী নানাভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবানই হচ্ছেন সব কিছুর *পতি*—

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥

ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন *প্রজাপতি*, তিনি সমস্ত জীবের পতি, তিনি সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের পতি, তিনি সমস্ত সৌন্দর্যের পতি এবং তিনি সকলের ত্রাণকর্তা। তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে জীব যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তাঁকে তুষ্ট করতে পারে এবং তার ফলে তারা এই জড় জগতে নিরুদ্বিগ্নভাবে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে। তারপর এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর তারা ভগবানের অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করতে পারে। অপার করুণাময় ভগবান মায়াবদ্ধ জীবের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বদ্ধ জীব ক্রমশ কৃষ্ণচেতনা লাভ করে এবং সর্ব বিষয়ে ভগবানের দিব্য গুণাবলী অর্জন করে। বৈদিক শাস্ত্রে এই কলিযুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম-কীর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন যাতে এই যুগের সব জীবই এই জড় বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। সংকীর্তন যজ্ঞ এবং কৃষ্ণভাবনা একই সঙ্গে চলবে। কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করবেন, সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"এই কলিযুগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মনীষিরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্ষদযুক্ত ভগবান শ্রীগৌরহরির আরাধনা করবেন।" বৈদিক শাস্ত্রে আর যে সমস্ত যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির অনুষ্ঠান করা এই কলিযুগে সম্ভব নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ এত সহজ ও উচ্চস্তরের যে, সকল উদ্দেশ্যে অনায়াসে যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/১৪) তা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ১১

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

দেবান্—দেবতারা; **ভাবয়তা**—সন্তুষ্ট হয়ে; **অনেন**—এই যজ্ঞের দ্বারা; **তে**—সেই; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ভাবয়ন্তু**—প্রীতি সাধন করবেন; **বঃ**—তোমাদের; **পরস্পরম্**—পরস্পর; **ভাবয়ন্তঃ**—প্রীতি সাধন করে; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **পরম্**—পরম; **অবাপ্স্যথ**—লাভ করবে।

গীতার গান

অধিকারী দেবগণ যজ্ঞের প্রভাবে ।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান দেখি সবে প্রীত হবে ॥
পরস্পর প্রীতিভাব হলে সম্পাদন ।
ভোগের সামগ্রী শ্রেয় নহে অনটন ॥

অনুবাদ

তোমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রীত হয়ে দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন। এভাবেই পরস্পরের প্রীতি সম্পাদন করার মাধ্যমে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান জড় জগতের দেখাশোনার ভার ন্যস্ত করেছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবের জীবন ধারণের জন্য আলো, বাতাস, জল আদির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ভগবান তাই এই সমস্ত অকাতরে দান করেছেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তির তত্ত্বাবধান করার ভার তিনি দিয়েছেন বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর, যাঁরা হচ্ছেন তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশস্বরূপ। এই সমস্ত দেব-দেবীর প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নতা নির্ভর করে মানুষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপর। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর তুষ্টি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু তা হলেও সমস্ত যজ্ঞের যজ্ঞপতি এবং পরম ভোক্তারূপে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা—*ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্*। তাই যজ্ঞপতির চরম তুষ্টবিধান করাই হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্ত যজ্ঞগুলি যখন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তখন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দান করেন এবং মানুষের তখন আর কোন অভাব থাকে না।

এভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলে ধন-ঐশ্বর্য লাভ হয় ঠিকই, কিন্তু এই লাভগুলি যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

যজ্ঞপতি বিষ্ণু যখন প্রীত হন, তখন তিনি জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সব রকমের কার্যকলাপ পরিশুদ্ধ হয়, তাই *বেদে* বলা হয়েছে—*আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ*। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে খাদ্যসামগ্রী শুদ্ধ হয় এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্তা শুদ্ধ হবার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষ লাভের পথ খুঁজে পায়। এভাবেই জীবের চেতনা কলুষমুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার পথে অগ্রসর হয়। এই শুদ্ধ চেতনা সুপ্ত হয়ে গেছে বলেই আজকের জগৎ এই রকম বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শ্লোক ১২

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

ইষ্টান্—বাঞ্ছিত; **ভোগান্**—ভোগ্যবস্তু; **হি**—অবশ্যই; **বঃ**—তোমাদের; **দেবাঃ**—দেবতারা; **দাস্যন্তে**—দান করবেন; **যজ্ঞভাবিতাঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে; **তৈঃ**—তাঁদের দ্বারা; **দত্তান্**—প্রদত্ত বস্তুসকল; **অপ্রদায়**—নিবেদন না করে; **এভ্যঃ**—দেবতাদেরকে; **যঃ**—যে; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **স্তেনঃ**—চোর; **এব**—অবশ্যই; **সঃ**—সে।

গীতার গান

যজ্ঞেতে সন্তুষ্ট হয়ে অভীষ্ট যে ভোগ ।
দেবতারা দেয় সব প্রচুর প্রয়োগ ॥
সেই দত্ত অন্ন যাহা দেবতারা দেয় ।
তাঁহাদের না দিয়া খায় চোর সেই হয় ॥

অনুবাদ

যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করবেন। কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই চোর।

তাৎপর্য

জীবের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীরা সরবরাহ করছেন। তাই, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে

এই সমস্ত দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *বেদে* বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে তাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে বলা হয়েছে। মানুষেরা যে বিভিন্ন জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত, সেই অনুসারে *বেদে* বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, যারা মাংসাশী তাদের জড়া প্রকৃতির বীভৎস-রূপী কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কালীর কাছে পশুবলি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে। সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধীরে ধীরে জড় স্তর অতিক্রম করে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া। সাধারণ লোকদের অন্তত পঞ্চমহাযজ্ঞ নামক পাঁচটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য।

আমাদের বোঝা উচিত যে, মনুষ্য-সমাজে যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই আসছে ভগবানের প্রতিনিধি বিভিন্ন দেব-দেবীদের কাছ থেকে। কোন কিছু তৈরি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। যেমন, মানব-সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য—ফল-মূল, শাক-সবজি, দুধ, চিনি, এগুলির কোনটাই আমরা তৈরি করতে পারি না। তেমনই আবার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি—যেমন উত্তাপ, আলো, বাতাস, জল আদিও কেউ তৈরি করতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছার ফলেই সূর্য কিরণ দান করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, বৃষ্টির ধারায় ধরণী রসসিক্ত হয়। এগুলি ছাড়া কেউই বাঁচতে পারে না। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, আমাদের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই ভগবান আমাদের দিচ্ছেন। এমন কি, কলকারখানায় আমরা যে সমস্ত জিনিস বানাচ্ছি, তাও তৈরি হচ্ছে ভগবানেরই দেওয়া বিভিন্ন ধাতু, গন্ধক, পারদ, ম্যাঙ্গানীজ আদি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি দিয়ে। আমাদের অগোচরে ভগবান আমাদের সমস্ত প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমরা আত্ম-উপলব্ধির জন্য স্বচ্ছল জীবন যাপন করে জীবনের পরম লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারি, অর্থাৎ যাকে বলা হয় জড়-জাগতিক জীবন-সংগ্রাম থেকে চিরতরে মুক্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে। আমরা যদি জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে ভগবানের দেওয়া সম্পদগুলি কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ব্যবহার করি এবং তার বিনিময়ে ভগবানকে এবং তাঁর প্রতিনিধিদের কিছুই না দিই, তবে তা চুরি করারই সামিল

এবং তা যদি আমরা করি, তা হলে প্রকৃতির আইনে আমাদের শাস্তিভোগ করতেই হবে। যে সমাজ চোরের সমাজ, তা কখনই সুখী হতে পারে না, কেন না তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। স্থূল জড়বাদী যে সমস্ত চোরেরা ভগবানের সম্পদ চুরি করে জড় জগৎকে ভোগ করতে উন্মত্ত, তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা; যজ্ঞ করে কিভাবে ভগবানের ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করতে হয়, তা তারা জানে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব চাইতে সহজ যজ্ঞ—সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন। এই যজ্ঞ যে কেউ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং তার ফলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত পান করতে পারে।

শ্লোক ১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞশিষ্ট—যজ্ঞাবশেষ; **অশিনঃ**—ভোজনকারী; **সন্তঃ**—ভক্তগণ; **মুচ্যন্তে**—মুক্ত হন; **সর্ব**—সর্ব প্রকার; **কিল্বিষৈঃ**—পাপ থেকে; **ভুঞ্জতে**—ভোগ করে; **তে**—তারা; **তু**—কিন্তু; **অঘম্**—পাপ; **পাপাঃ**—পাপীরা; **যে**—যারা; **পচন্তি**—পাক করে; **আত্মকারণাৎ**—নিজের জন্য।

গীতার গান

যজ্ঞের সাধন করি অন্ন যেবা খায় ।
মুক্তির পথেতে চলে পাপ নাহি হয় ॥
আর যেবা অন্ন পাক নিজ স্বার্থে করে ।
পাপের বোঝা ক্রমে বাড়ে দুঃখভোগ তরে ॥

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে।

তাৎপর্য

যে ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত পান করেছেন, তাঁকে বলা হয় সন্ত। তিনি সব সময় ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৩৮) তার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। যেহেতু সন্তগণ সদাসর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান গোবিন্দ (আনন্দ প্রদানকারী) অথবা মুকুন্দ (মুক্তিদাতা) অথবা শ্রীকৃষ্ণ (সর্বাকর্ষক পুরুষ)-এর প্রেমে মগ্ন থাকেন, সেই জন্য তাঁরা ভগবানকে প্রথমে অর্পণ না করে কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। তাই, এই ধরনের ভক্তেরা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন আদি বিবিধ ভক্তির অঙ্গের দ্বারা সর্বক্ষণই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন এবং এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ফলে তাঁরা কখনই জড় জগতের কলুষতার দ্বারা প্রভাবিত হন না। অন্য সমস্ত লোকেরা, যারা আত্মতৃপ্তির জন্য নানা রকম উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে খায়, শাস্ত্রে তাদের চোর বলে গণ্য করা হয়েছে এবং তাদের সেই খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাপও গ্রহণ করে। যে মানুষ চোর ও পাপী সে কি করে সুখী হতে পারে? তা কখনই সম্ভব নয়। তাই, সর্বতোভাবে সুখী হবার জন্য তাদের কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সং কীর্তন যজ্ঞ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে, এই পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি লাভের কোন আশাই নেই।

শ্লোক ১৪

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্নাৎ—অন্ন থেকে; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **ভূতানি**—জড় দেহ; **পর্জন্যাৎ**—বৃষ্টি থেকে; **অন্ন**—অন্ন; **সম্ভবঃ**—উৎপন্ন হয়; **যজ্ঞাৎ**—যজ্ঞ থেকে; **ভবতি**—সম্ভব হয়; **পর্জন্যঃ**—বৃষ্টি; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **কর্ম**—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভব হয়।

গীতার গান

অন্ন খেয়ে জীব বাঁচে অন্ন যে জীবন ।
সেই অন্ন উৎপাদনে বৃষ্টি যে কারণ ॥
সেই বৃষ্টি হয় যদি যজ্ঞ কার্যে হয় ।
সেই যজ্ঞ সাধ্য হয় কর্মের কারণ ॥

অনুবাদ

অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ *ভগবদ্গীতার* ভাষ্যে লিখেছেন—*যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্য তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি, তে সন্তঃ সর্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্বকিল্বিষৈরনাদিকালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভব-প্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পাপৈর্বিমুচ্যন্তে*। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন যজ্ঞপুরুষ, অর্থাৎ সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হচ্ছেন তিনিই। তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেব-দেবীরও ঈশ্বর। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন সারা দেহের সেবা করে, ভগবানের অঙ্গস্বরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীরাও তেমন ভগবানের সেবা করেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের ভগবান নিযুক্ত করেছেন জড় জগৎকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিভাবে যজ্ঞ করার মাধ্যমে এই সমস্ত দেবতাদের সন্তুষ্ট করা যায়। এভাবে সন্তুষ্ট হলে তাঁরা আলো, বাতাস, জল আদি দান করেন, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হলে ভগবানের অংশ-বিশেষ দেব-দেবীরাও সেই সঙ্গে পূজিত হন; তাই তাদের আর আলাদা করে পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। এই কারণে, কৃষ্ণভাবনাময় ভগবানের ভক্তেরা ভগবানকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে তারপর তা গ্রহণ করেন। তার ফলে দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এভাবে খাদ্য গ্রহণ করার ফলে শুধু যে দেহের মধ্যে সঞ্চিত বিগত সমস্ত পাপ-কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, জড়া প্রকৃতির সকল কলুষ থেকেও দেহ বিমুক্ত হয়। যখন কোন সংক্রামক ব্যাধি মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগ-প্রতিষেধক টীকা নিলে মানুষ তা থেকে রক্ষা পায়। সেই রকম, ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করার পরে সেই আহার্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করলে জাগতিক কলুষতার প্রভাব থেকে যথেষ্ট রক্ষা পাওয়া যায় এবং যাঁরা এভাবে অনুশীলন করেন, তাঁদের ভগবদ্ভক্ত বলা হয়। তাই, কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি, যিনি কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করে জীবন ধারণ করেন, তিনি বিগত জড় সংক্রমণগুলিকে প্রতিরোধ করতে পারেন এবং এই সংক্রমণগুলি আত্ম-উপলব্ধির উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। পক্ষান্তরে, যে ভগবানকে নিবেদন না করে কেবল নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে, তার পাপের বোঝা বাড়তে থাকে এবং তার মনোবৃত্তি অনুসারে সে পরবর্তী জীবনে শূকর ও কুকুরের মতো নিকৃষ্ট পশুদেহ ধারণ করে, যাতে সমস্ত পাপকর্মের ফল ভোগ করতে পারে। এই জড় জগৎ কলুষতাপূর্ণ, কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করলে সে কলুষমুক্ত হয় এবং সে তার শুদ্ধ সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়। তাই যে তা করে না, সে ভব-রোগের কলুষতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে।

খাদ্য-শস্য, শাক-সবজি, ফল-মূলই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত আহার্য, আর পশুরা মানুষের উচ্ছিষ্ট ও ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। যে সমস্ত মানুষ আমিষ আহার করে, তাদেরও প্রকৃতপক্ষে গাছপালার উপরই নির্ভর করতে হয়, কারণ যে পশুমাংস তারা আহার করে, সেই পশুগুলি গাছপালা ও অন্যান্য উদ্ভিদের দ্বারাই পুষ্ট। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতির দান মাঠের ফসলের উপর নির্ভর করেই আমরা প্রকৃতপক্ষে জীবন ধারণ করি, বড় বড় কলকারখানায় তৈরি জিনিসের উপরে নির্ভর করে নয়। আকাশ থেকে বৃষ্টি হবার ফলে ক্ষেতে ফসল হয়। এই বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারা। এঁরা সকলেই হচ্ছেন ভগবানের আজ্ঞাবাহক ভৃত্য। তাই, যজ্ঞ করে ভগবানকে তুষ্ট করলেই তাঁর ভৃত্যেরাও তুষ্ট হন এবং তাঁরা তখন সমস্ত অভাব মোচন করেন। এই যুগের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ, তাই অন্ততপক্ষে খাদ্য সরবরাহের অভাব-অনটন থেকে রেহাই পেতে গেলে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। এই সংকীর্তন যজ্ঞ করলে মানুষের খাওয়া-পরার আর কোন অভাব থাকবে না।

শ্লোক ১৫

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ম—কর্ম; **ব্রহ্ম**—বেদ থেকে; **উদ্ভবম্**—উদ্ভূত; **বিদ্ধি**—জানবে; **ব্রহ্ম**—বেদ; **অক্ষর**—পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর ভগবান) থেকে; **সমুদ্ভবম্**—সম্যকরূপে উদ্ভূত; **তস্মাৎ**—অতএব; **সর্বগতম্**—সর্বব্যাপক; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **নিত্যম্**—নিত্য; **যজ্ঞে**—যজ্ঞে; **প্রতিষ্ঠিতম্**—প্রতিষ্ঠিত।

গীতার গান

কর্ম যাহা বেদবাণী নহে মনোধর্ম ।
বেদবাণী ভগবদুক্তি অক্ষরের কারণ ॥
অতএব কর্ম হয় ঈশ্বরসাধনা ।
সর্বগত ব্রহ্মনিত্য যজ্ঞেতে স্থাপনা ॥

অনুবাদ

যজ্ঞাদি কর্ম বেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর বা পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্যই যে কর্ম করা প্রয়োজন, সেই কথা এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টির জন্যই যখন আমাদের কর্ম করতে হয়, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে *বেদের* নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম সাধন করা। *বেদে* সমস্ত কর্মপদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। যে কর্ম *বেদে* অনুমোদিত হয়নি, তাকে বলা হয় বিকর্ম বা পাপকর্ম। তাই, *বেদের* নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম করাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, তাতে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। সাধারণ অবস্থায় যেমন মানুষকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে চলতে হয়, তেমনই ভগবানের নির্দেশে তাঁর পরম রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়াই মানুষের কর্তব্য। *বেদের* সমস্ত নির্দেশগুলি সরাসরি ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—*অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ।* "*ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ* ও *অথর্ববেদ*—এই সব কয়টি *বেদই* ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয়েছে।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/৫/১১*) ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি নিঃশ্বাসের দ্বারাও কথা বলতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* বলা হয়েছে, সর্ব শক্তিমান ভগবান তাঁর যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সব কয়টি ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর নিঃশ্বাসের দ্বারা কথা বলতে পারেন, তাঁর দৃষ্টির দ্বারা গর্ভসঞ্চার করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে প্রাণের সঞ্চার হয়। জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীব সৃষ্টি করার পর, এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা যাতে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে, সেই জন্যই তিনি বৈদিক জ্ঞান দান করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, এই জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড় সুখভোগ করতে চায়। কিন্তু বৈদিক নির্দেশাবলী এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের বিকৃত বাসনাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে পারি, তারপর তথাকথিত সুখভোগ পরিসমাপ্ত করে ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারি। জড় জগতের দুঃখময় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবান জীবকে এভাবে করুণা করেছেন। তাই, প্রতিটি জীবের কর্তব্য হচ্ছে

কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞ করা। যারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে না, তারা যদি কৃষ্ণচেতনা বা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে, তবে তারাও বৈদিক যজ্ঞের সমস্ত সুফলগুলি প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৬

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এবম্—এই প্রকারে; **প্রবর্তিতম্**—বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; **চক্রম্**—চক্র; **ন**—করে না; **অনুবর্তয়তি**—গ্রহণ; **ইহ**—এই জীবনে; **যঃ**—যিনি; **অঘায়ুঃ**—পাপপূর্ণ জীবন; **ইন্দ্রিয়ারামঃ**—ইন্দ্রিয়াসক্ত; **মোঘম্**—বৃথা; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র (অর্জুন); **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **জীবতি**—জীবন ধারণ করে।

গীতার গান

সেই সে ব্রহ্মের চক্র আছে প্রবর্তিত ।
সে চক্রে যে নাহি হয় বিশেষ বর্তিত ॥
পাপের জীবন তার অতি ভয়ঙ্কর ।
ইন্দ্রিয় প্রীতয়ে করে পাপ পরস্পর ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি এই জীবনে বেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থা অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ পাপী ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

তাৎপর্য

বৈষয়িক জীবন-দর্শন অনুযায়ী, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার যে অর্থহীন প্রচেষ্টা, তা অতি ভয়ংকর পাপের জীবন বলে ভগবান তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই, যারা জড়-জাগতিক সুখভোগ করতে চায়, তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। যারা তা করে না, তারা অত্যন্ত জঘন্য জীবন যাপন করছে, কারণ তাদের পাপের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তারা ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে। প্রকৃতির নিয়মে এই মনুষ্য-জীবন পাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে

একটিকে অবলম্বন করে আত্ম-উপলব্ধি করা। পাপ-পুণ্যের অতীত পরমার্থবাদীদের কঠোরভাবে শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন আবশ্যকতা নেই; কিন্তু যারা জড় বিষয়ভোগে লিপ্ত, তাদের এই সমস্ত যজ্ঞ করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। মানুষ নানা ধরনের কর্মে লিপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু ভগবানের সেবায় কর্ম না করা হলে সমস্ত কর্মই সাধিত হয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য; তাই পুণ্যকর্ম করে তাদের পাপের ভার লাঘব করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ কামনা-বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ, তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই তাদের জন্য যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, যাতে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে পারে, অথচ সেই কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে। এই জগতের উন্নতি আমাদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে অলক্ষ্যে ভগবানের ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞাবাহক দেব-দেবীর উপর। তাই *বেদের* নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ করে দেব-দেবীদের তুষ্ট করা হলে পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবীদের তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা এবং এভাবেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে করতে জীবের অন্তরে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও যদি অন্তরে কৃষ্ণভক্তির উদয় না হয়, তবে বুঝতে হবে, তা কেবল উদ্দেশ্যহীন নৈতিক আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, *বেদের* নির্দেশগুলিকে কেবল নৈতিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত না রেখে, তার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভের চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৭

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে; **তু**—কিন্তু; **আত্মরতিঃ**—আত্মারাম; **এব**—অবশ্যই; **স্যাৎ**—থাকেন; **আত্মতৃপ্তঃ**—আত্মতৃপ্ত; **চ**—এবং; **মানবঃ**—মানুষ; **আত্মনি**—আত্মাতে; **এব**—কেবল; **চ**—এবং; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **তস্য**—তাঁর; **কার্যম্**—কর্তব্যকর্ম; **ন**—নেই; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান।

গীতার গান

আর যে বুঝিয়াছে আত্মতত্ত্বসার ।
কার্য কর্ম কিছু নাই করিবার তার ॥

পূর্ণজ্ঞানে ভগবানে ভক্তি করে যেই ।
আত্মতৃপ্ত আত্মজ্ঞানী তুষ্ট আত্মাতেই ॥

অনুবাদ

কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই।

তাৎপর্য

যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় এবং কৃষ্ণসেবায় যিনি সম্পূর্ণভাবে মগ্ন, তাঁর অন্য কোন কর্তব্য নেই। কৃষ্ণভক্তি লাভ করার ফলে তাঁর অন্তর সম্পূর্ণভাবে কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয়েছে। হাজার হাজার যজ্ঞ অনুষ্ঠানেও যে ফল লাভ করা যায় না, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে তা মুহূর্তের মধ্যে সাধিত হয়। এভাবে চেতনা শুদ্ধ হলে জীব পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর নিত্যকালের সম্পর্ক উপলব্ধিই করতে পারেন। তখন ভগবানের কৃপায় তাঁর কর্তব্যকর্ম স্বয়ং জ্ঞানালোকিত হয় এবং তাই তিনি আর বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য-অকর্তব্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। এই রকম কৃষ্ণভক্ত জীবের আর জড় বিষয়াসক্তি থাকে না এবং কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি তাঁর আর কোন মোহ থাকে না।

শ্লোক ১৮

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন—নেই; **এব**—অবশ্যই; **তস্য**—তাঁর; **কৃতেন**—কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **অর্থঃ**—প্রয়োজন; **ন**—নেই; **অকৃতেন**—কর্তব্যকর্ম না করলেও; **ইহ**—এই জগতে; **কশ্চন**—কোন কারণ; **ন**—নেই; **চ**—ও; **অস্য**—এর; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত প্রাণীর মধ্যে; **কশ্চিৎ**—কেউই; **অর্থ**—প্রয়োজন; **ব্যপাশ্রয়ঃ**—আশ্রয় গ্রহণ।

গীতার গান

অর্থানর্থ বিচারাদি আত্মতৃপ্ত নহে ।
কর্তব্যাকর্তব্য যাহা কিছু বেদশাস্ত্র কহে ॥

সে নহে কাহার ঋণী নিজার্থ সাধনে ।
সর্বস্ব হয়েছে পূর্ণ শরণ্য শরণে ॥

অনুবাদ

আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যক্তির এই জগতে ধর্ম অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং এই প্রকার কর্ম না করারও কোন কারণ নেই। তাকে অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতেও হয় না।

তাৎপর্য

যে মানুষ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করে জানতে পেরেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তিনি আর সামাজিক কর্তব্য-অকর্তব্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেন না। কারণ, তিনি তখন বুঝতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাটাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্যকর্ম। অনেকে আত্মজ্ঞান লাভ করার নাম করে কর্মবিহীন আলস্যপূর্ণ জীবন যাপন করে। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ভগবান আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, নিষ্কর্মা, অলস লোকেরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। কারণ, কৃষ্ণভক্তি মানে হচ্ছে কৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা, তাই কৃষ্ণভক্ত একটি মুহূর্তকেও নষ্ট হতে দেন না। তিনি প্রতিটি মহূর্তকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন। অন্যান্য দেব-দেবীদের পূজা করাটাও কর্তব্য বলে ভগবানের ভক্ত মনে করেন না। কারণ, তিনি জানেন, কেবল ভগবানের সেবা করলেই সকলের সেবা করা হয়।

শ্লোক ১৯

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর ।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অসক্তঃ**—আসক্তি রহিত হয়ে; **সততম্**—সর্বদা; **কার্যম্**—কর্তব্য; **কর্ম**—কর্ম; **সমাচর**—অনুষ্ঠান কর; **অসক্তঃ**—অনাসক্ত হয়ে; **হি**—অবশ্যই; **আচরন্**—অনুষ্ঠান করলে; **কর্ম**—কর্ম; **পরম্**—পরতত্ত্ব; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **পুরুষঃ**—মানুষ।

গীতার গান

অতএব অনাসক্ত হয়ে কার্য কর ।
যুক্ত বৈরাগ্য সেই তাতে হও দৃঢ় ॥

অনাসক্ত কার্য করে পরম পদেতে ।
যোগ্য হয় ক্রমে ক্রমে সে পদ লভিতে ॥

অনুবাদ

অতএব, কর্মফলের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলেই মানুষ পরতত্ত্বকে লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী মুক্তি চান, কিন্তু ভক্ত কেবল পরম পুরুষ ভগবানকে চান। তাই, সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে যখন কেউ ভগবানের সেবা করেন, তখন মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন, কারণ সেটি ছিল তাঁর ইচ্ছা। সৎ কর্ম করে, অহিংসা ব্রত পালন করে ভাল মানুষ হওয়াটাই স্বার্থপর কর্ম, কিন্তু সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিচার না করে ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাটাই হচ্ছে বৈরাগ্য। এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম; ভগবান নিজেই সেই উপদেশ দিয়ে গেছেন।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত অসৎ কর্মের কুফল থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু ভগবানের সেবায় যে কর্ম সাধিত হয়, তা অপ্রাকৃত কর্ম এবং তা শুভ ও অশুভ কর্মবন্ধনের অতীত। কৃষ্ণভক্ত যখন কোন কর্ম করেন, তা তিনি তাঁর ফলভোগ করার জন্য করেন না, তা তিনি করেন কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সব রকম কর্ম করেন, কিন্তু সেই সমস্ত কর্ম থেকে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ থাকেন।

শ্লোক ২০

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

কর্মণা—কর্মের দ্বারা; **এব**—কেবল; **হি**—অবশ্যই; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **আস্থিতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **জনকাদয়ঃ**—জনক আদি রাজারা; **লোকসংগ্রহম্**—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য; **এব অপি**—ও; **সংপশ্যন্**—বিবেচনা করে; **কর্তুম্**—কর্ম করা; **অর্হসি**—উচিত।

গীতার গান

জনকাদি মহাজন কর্ম সাধ্য করি ।
সিদ্ধিলাভ করেছিল আপনি আচরি ॥
তুমিও সেরূপ কর লোকশিক্ষা লাগি ।
লাভ নাই কিছুমাত্র মর্কট বৈরাগী ॥

অনুবাদ

জনক আদি রাজারাও কর্ম দ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব, জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত।

তাৎপর্য

জনক রাজা আদি মহাজনেরা ছিলেন ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী, তাই *বেদের* নির্দেশ অনুসারে নানা রকম যাগ-যজ্ঞ করার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁদের ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করতেন। জনক রাজা ছিলেন সীতাদেবীর পিতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর। ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত হবার ফলে তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি মিথিলার (ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের একটি অঞ্চলের) রাজা ছিলেন, তাই তাঁর প্রজাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তেমনই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর চিরন্তন সখা অর্জুনের পক্ষে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার কোনও দরকার ছিল না, কিন্তু সদুপদেশ ব্যর্থ হলে হিংসা অবলম্বনেরও প্রয়োজন আছে, এই কথা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্যই তাঁরা যুদ্ধে নেমেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, শান্তি স্থাপন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল, এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুরাত্মারা যুদ্ধ করতেই বদ্ধপরিকর। এই রকম অবস্থায় যথার্থ কারণে হিংসার আশ্রয় নিয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াটা অবশ্যই কর্তব্য। যদিও কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তের জড় জগতের প্রতি কোন রকম স্পৃহা নেই, কিন্তু তবুও তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কর্তব্যকর্মগুলি সম্পাদন করেন। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত এমনভাবে কর্ম করেন, যাতে সকলে তাঁর অনুগামী হয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

যৎ যৎ—যেভাবে যেভাবে; **আচরতি**—আচরণ করেন; **শ্রেষ্ঠঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; **তৎ তৎ**—সেই সেভাবেই; **এব**—অবশ্যই; **ইতরঃ**—সাধারণ; **জনঃ**—মানুষ; **সঃ**—তিনি; **যৎ**—যা; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **কুরুতে**—স্বীকার করেন; **লোকঃ**—সারা পৃথিবী; **তৎ**—তা; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

গীতার গান

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করে লোকের আদর্শ ।
ইতর জনতা যাহা করে হয় হর্ষ ॥
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কিছু প্রামাণ্য স্বীকারে ।
তাহাই স্বীকার্য হয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা তার অনুকরণ করে। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, সমগ্র পৃথিবী তারই অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষদের এমনই একজন নেতার প্রয়োজন হয়, যিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। যে নেতা নিজেই ধূমপানের প্রতি আসক্ত, তিনি জনসাধারণকে ধূমপান থেকে বিরত হতে শিক্ষা দিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, শিক্ষা দেওয়া শুরু করার আগে থেকেই শিক্ষকের সঠিকভাবে আচরণ করা উচিত। এভাবেই যিনি শিক্ষা দেন, তাঁকে বলা হয় আচার্য অথবা আদর্শ শিক্ষক। তাই, জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই শাস্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে চলতে হয়। কেউ যদি শাস্ত্র-বহির্ভূত মনগড়া কথা শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক হতে চায়, তাতে কোন লাভ তো হয়ই না, বরং ক্ষতি হয়। *মনুসংহিতা* ও এই ধরনের শাস্ত্রে ভগবান নিখুঁত সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং এই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সমাজকে গড়ে তোলাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। এভাবেই নেতাদের শিক্ষা এই ধরনের আদর্শ শাস্ত্র অনুযায়ী

হওয়া উচিত। যিনি নিজের উন্নতি কামনা করেন, তাঁর আদর্শ নীতি অনুসরণ করা উচিত, যা মহান আচার্যেরা অনুশীলন করে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে*ও বলা হয়েছে, পূর্বতন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনযাপন করা উচিত, তা হলেই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান, পিতা ও শিক্ষক হচ্ছেন স্বাভাবিকভাবেই নিরীহ জনগণের পথপ্রদর্শক। জনসাধারণকে পরিচালনা করার মহৎ দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। তাই তাঁদের উচিত, শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি করে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জনসাধারণকে পরিচালিত করে, এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা। এটি কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু এর ফলে যে সমাজ গড়ে উঠবে, তাতে প্রতিটি মানুষের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ২২

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

ন—না; **মে**—আমার; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **অস্তি**—আছে; **কর্তব্যম্**—কর্তব্য; **ত্রিষু**—তিন; **লোকেষু**—জগতে; **কিঞ্চন**—কোন; **ন**—না; **অনবাপ্তম্**—অপ্রাপ্ত; **অবাপ্তব্যম্**—প্রাপ্তব্য; **বর্তে**—যুক্ত আছি; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **কর্মণি**—শাস্ত্রোক্ত কর্মে।

গীতার গান

আমার কর্তব্য নাই ত্রিভুবন মাঝে ।
পার্থ তুমি জান কেবা সমতুল্য আছে ॥
প্রাপ্তব্য বলিয়া কিছু কোথা নাহি মোর ।
তথাপি দেখহ আমি কর্তব্যে বিভোর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! এই ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্ত কিছু নেই এবং প্রাপ্তব্যও কিছু নেই। তবুও আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥
ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"ভগবান হচ্ছেন ঈশ্বরদেরও পরম ঈশ্বর এবং দেবতাদেরও পরম দেবতা। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দান করেন; তাঁরা কেউ পরমেশ্বর নয়। তিনি সমস্ত দেবতাদের পূজ্য এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত পতিদের পরম পতি। তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত অধিপতি ও নিয়ন্তার অতীত, সকলের পূজ্য। তাঁর থেকে বড় আর কিছুই নেই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

"তাঁর দেহ সাধারণ জীবের মতো নয়। তাঁর দেহ এবং তাঁর আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি হচ্ছেন পূর্ণ, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃত। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই যে-কোন ইন্দ্রিয়ের কর্ম সাধন করতে পারে। তাই তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। তাঁর শক্তি অসীম ও বহুমুখী, তাই তাঁর সমস্ত কর্ম স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়ে যায়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৭-৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর কোন কর্তব্য নেই। কর্মের ফল যাদের ভোগ করতে হয়, তাদের জন্যই কর্তব্যকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু এই ত্রিভুবনে যাঁর কোন কিছুই কাম্য নেই, তাঁর কোন কর্তব্যকর্মও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করেছেন, কেন না দুর্বলদের রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। যদিও তিনি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের অতীত, কিন্তু তবুও তিনি শাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করেন না।

শ্লোক ২৩

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

যদি—যদি; **হি**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **বর্তেয়ম্**—প্রবৃত্ত হই; **জাতু**—কখনও; **কর্মণি**—শাস্ত্রোক্ত কর্মে; **অতন্দ্রিতঃ**—অনলস হয়ে; **মম**—আমার; **বর্ত্ম**—পথ; **অনুবর্তন্তে**—অনুসরণ করবে; **মনুষ্যাঃ**—সমস্ত মানুষ; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

আমি যদি কর্ম ত্যজি অতন্দ্রিত হয়ে ।
মম বর্ত্ম সবে অনুগমন করয়ে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! আমি যদি অনলস হয়ে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে আমার অনুবর্তী হয়ে সমস্ত মানুষই কর্ম ত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি লাভের জন্য সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় এবং এভাবে সমাজকে গড়ে তোলবার জন্য প্রতিটি সভ্য মানুষকে নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করে সুসংযত জীবন যাপন করতে হয়। এই সমস্ত নিয়মকানুনের বিধি-নিষেধ কেবল বদ্ধ জীবেদের জন্য, ভগবানের জন্য নয়। যেহেতু তিনি ধর্মনীতি প্রবর্তনের জন্য অবতরণ করেছিলেন, তাই তিনি শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত বিধির অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভগবান এখানে বলছেন, যদি তিনি এই সমস্ত বিধি-নিষেধের আচরণ না করেন, তবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি, এই পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘরে-বাইরে সর্বত্র গৃহস্থোচিত সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

উৎসীদেয়ুঃ—উৎসন্ন হবে; **ইমে**—এই সমস্ত; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **ন**—না; **কুর্যাম্**—করি; **কর্ম**—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; **চেৎ**—যদি; **অহম্**—আমি; **সঙ্করস্য**—

বর্ণসঙ্করের; চ—এবং; কর্তা—কর্তা; স্যাম্—হব; উপহন্যাম্—বিনষ্ট হবে; ইমাঃ—এই সমস্ত; প্রজাঃ—জীব।

গীতার গান

ফল এই হবে সবাই উচ্ছন্ন যাবে ।
আমার দর্শিত পথ দেখার অভাবে ॥
বিধি আর কিছু নাহি রবে ধরাতলে ।
বিনষ্ট হইবে এই প্রজারা সকলে ॥

অনুবাদ

আমি যদি কর্ম না করি, তা হলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হবে। আমি বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কারণ হব এবং তার ফলে আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

বর্ণসঙ্কর হবার ফলে অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ভরে ওঠে এবং তার ফলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এই ধরনের সামাজিক উপদ্রব রোধ করবার জন্য শাস্ত্রে নানা রকমের বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া আছে, যা অনুসরণ করার ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং সুস্থ মনোভাবাপন্ন হয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে। ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জীবের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের তাৎপর্য ও তাদের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষকে বুঝিয়ে দেন। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জগতের পিতা, তাই জীব যদি বিপথগামী হয়ে পথভ্রষ্ট হয়, পক্ষান্তরে ভগবানই তার জন্য দায়ী হন। তাই, মানুষ যখন শাস্ত্রের অনুশাসন না মেনে যথেচ্ছাচার করতে শুরু করে, তখন ভগবান নিজে অবতরণ করে পুনরায় সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনই আমাদের মনে রাখতে হবে, ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য, ভগবানকে অনুকরণ করা কোন অবস্থাতেই আমাদের উচিত নয়। অনুসরণ করা আর অনুকরণ করা এক পর্যায়ভুক্ত নয়। ভগবান তাঁর শৈশবে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুকরণ করে আমরা গোবর্ধন পর্বত তুলতে পারি না। কোন মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। ভগবানের সমস্ত লীলাই অসাধারণ, তাঁর লীলা অনুকরণ করে ভগবান হবার চেষ্টা করা মূর্খতারই নামান্তর। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনের

প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া, কোন অবস্থাতেই তাঁর অস্বাভাবিক লীলার অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৩৩/৩০-৩১) বলা হয়েছে—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥

"ভগবান এবং তাঁর শক্তিতে শক্তিমান ভক্তদের নির্দেশ সকলের অনুসরণ করা কর্তব্য। তাঁদের দেওয়া উপদেশ আমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করে এবং যে মানুষ বুদ্ধিমান, সে যথাযথভাবে এই সমস্ত উপদেশগুলিকে পালন করে। কিন্তু আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা উচিত যাতে আমরা কখনও তাঁদের অনুকরণ না করি। দেবাদিদেব মহাদেবকে অনুকরণ করে বিষ পান করা আমাদের কখনই উচিত নয়।"

আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের পদ বিবেচনা করা উচিত, অথবা যাঁরা অসীম ক্ষমতাশালীরূপে চন্দ্র ও সূর্যের গতি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এই প্রকার শক্তি ছাড়া, কারও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরদের অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের অনুসরণ করা। সমুদ্র-মন্থনের সময় যে বিষ উঠেছিল, তা পান করে মহাদেব জগৎকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ যদি তার এক কণা বিষও পান করে, তবে তার মৃত্যু অবধারিত। কিছু মূর্খ লোক আছে, যারা নিজেদের মহাদেবের ভক্ত বলে প্রচার করে এবং মহাদেবের বিষ খাওয়ার অনুকরণ করে গাঁজা আদি মাদকদ্রব্য পান করে। তারা জানে না, এর মাধ্যমে তাদের মৃত্যুকে তারা ডেকে আনছে। তেমনই, কিছু ভণ্ড কৃষ্ণভক্তও দেখা যায়, যারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবার জন্য ভগবানের অতি অন্তরঙ্গ লীলা—রাসলীলার অনুকরণ করে। তারা ভেবেও দেখে না, ভগবানের মতো গোবর্ধন পর্বত তোলবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই শক্তিমানকে অনুকরণ না করে তাঁকে অনুসরণ করাটাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ভগবান যে সমস্ত উপদেশ দিয়ে গেছেন, তা পালন করলেই আমাদের পরমার্থ সাধিত হবে। কিন্তু তা না করে, যদি আমরা নিজেরাই ভগবান সাজতে চাই, তা হলে আমাদের অধঃপতন অবধারিত। আজকের জগতে বহু অবতারের দেখা মেলে—লোক ঠকাবার জন্য অনেক ভণ্ড নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে, কিন্তু সর্ব শক্তিমান ভগবানের সর্ব শক্তিমত্তার কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

শ্লোক ২৫

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ।
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

সক্তাঃ—আসক্ত হয়ে; **কর্মণি**—শাস্ত্রোক্ত কর্মে; **অবিদ্বাংসঃ**—অজ্ঞান মানুষেরা; **যথা**—যেমন; **কুর্বন্তি**—করে; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়; **কুর্যাৎ**—কর্ম করবেন; **বিদ্বান্**—জ্ঞানী ব্যক্তি; **তথা**—তেমন; **অসক্তঃ**—আসক্তি রহিত হয়ে; **চিকীর্ষুঃ**—পরিচালিত করতে ইচ্ছা করে; **লোকসংগ্রহম্**—জনসাধারণকে।

গীতার গান

বিদ্বানের যে কর্তব্য অবিদ্বান সম ।
বাহ্যত আসক্ত হয়ে কর্ম সমাগম ॥
অন্তরে আসক্তি নাই লোকের সংগ্রহ ।
বিদ্বানের হয় সেই কর্মেতে আগ্রহ ॥

অনুবাদ

হে ভারত! অজ্ঞানীরা যেমন কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়ে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, তেমনই জ্ঞানীরা অনাসক্ত হয়ে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য কর্ম করবেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এবং কৃষ্ণভাবনা-বিমুখ অভক্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তির পার্থক্য। কৃষ্ণভাবনার উন্নতি সাধনের পক্ষে যা সহায়ক নয়, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সেই সমস্ত কর্ম করেন না। অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মায়ামুগ্ধ জীবের কর্ম আর কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের কর্মকে অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে একই রকম বলে মনে হয়, কিন্তু মায়াচ্ছন্ন মূর্খ মানুষ তার সমস্ত কর্ম করে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার জন্য, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ তার কর্ম করে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধন করবার জন্য। তাই মানব-সমাজে কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজন, কেন না তাঁরাই মানুষকে জীবনের প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে পরিচালিত করতে পারেন। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে পাক খাচ্ছে; সেই কর্মকে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে অর্পণ করা যায়, তা কেবল তাঁরাই শেখাতে পারেন।

শ্লোক ২৬

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ ।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

ন—নয়; **বুদ্ধিভেদম্**—বুদ্ধিভ্রষ্ট; **জনয়েৎ**—জন্মানো উচিত; **অজ্ঞানাম্**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের; **কর্মসঙ্গিনাম্**—কর্মফলের প্রতি আসক্ত; **জোষয়েৎ**—নিযুক্ত করা উচিত; **সর্ব**—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **সমাচরন্**—অনুষ্ঠান করে।

গীতার গান

বুদ্ধিভেদ নাহি করি মূঢ় কর্মীদের ।
অজ্ঞানী যে হয় তারা তাই হেরফের ॥
তাই সে সাজাতে হবে সর্বকর্ম মাঝে ।
আপনি আচরি সব অবিদ্যার সাজে ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কর্মাসক্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করবেন না। বরং, তাঁরা ভক্তিযুক্ত চিত্তে সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের কর্মে প্রবৃত্ত করবেন।

তাৎপর্য

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ। সেটিই হচ্ছে *বেদের* শেষ কথা। *বেদের* সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, যাগ-যজ্ঞ আদি, এমন কি জড় কার্যকলাপের সমস্ত নির্দেশাদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যেহেতু বদ্ধ জীবেরা তাদের জড় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অতীত কোন কিছু জানে না, তাই তারা সেই উদ্দেশ্যে *বেদ* অধ্যয়ন করে। কিন্তু বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সকাম কর্ম ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাধ্যমে মানুষ ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হয়। তাই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণভক্ত কখনই অপরের কার্যকলাপ ও বিশ্বাসে বাধা দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা দেন, কিভাবে সমস্ত কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করা যেতে পারে। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত এমনভাবে আচরণ করেন, যার ফলে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞ

লোকেরাও উপলব্ধি করতে পারে, তাদের কি করা কর্তব্য। যদিও কৃষ্ণভাবনাহীন অজ্ঞ লোকদের কাজে বাধা দেওয়া উচিত নয়, তবে অল্প উন্নতিপ্রাপ্ত কৃষ্ণভক্ত বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের বিধির অপেক্ষা না করে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে। এই ধরনের ভাগ্যবান লোকের পক্ষে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের আচরণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে আর কোন কিছুই করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করলে সর্বকর্ম সাধিত হয়।

শ্লোক ২৭

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; **ক্রিয়মাণানি**—ক্রিয়মাণ; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **কর্মাণি**—সমস্ত কর্ম; **সর্বশঃ**—সর্বপ্রকার; **অহঙ্কার-বিমূঢ়**—অহঙ্কারের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; **আত্মা**—আত্মা; **কর্তা**—কর্তা; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এভাবে; **মন্যতে**—মনে করে।

গীতার গান

বিদ্বান মূর্খেতে হয় এই মাত্র ভেদ ।
প্রকৃতির বশ এক অন্য সে বিচ্ছেদ ॥
প্রকৃতির গুণে বশ কার্য করি যায় ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজে কর্তা হয় ॥
আপনার পরিচয় প্রকৃতির মানে ।
দেহে আত্মবুদ্ধি করে অসত্যের ধ্যানে ॥

অনুবাদ

অহঙ্কারে মোহাচ্ছন্ন জীব জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ও দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ী, এদের দুজনের কর্মকে আপাতদৃষ্টিতে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের

মধ্যে এক অসীম ব্যবধান রয়েছে। যে দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন, সে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেকেই সব কিছুর কর্তা বলে মনে করে। সে জানে না যে, তার দেহের মাধ্যমে যে সমস্ত কর্ম সাধিত হচ্ছে, তা সবই হচ্ছে প্রকৃতির পরিচালনায় এবং এই প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে ভগবানেরই নির্দেশ অনুসারে। জড়-জাগতিক মানুষ বুঝতে পারে না যে, সে সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। অহঙ্কারের প্রভাবে বিমূঢ় যে আত্মা, সে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে ভাবে, সে স্বাধীনভাবে কর্ম করে চলেছে, তাই সমস্ত কৃতিত্ব সে নিজেই গ্রহণ করে। এটিই হচ্ছে অজ্ঞানতার লক্ষণ। সে জানে না যে, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহটি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি এবং সেই জন্যই কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে তার দৈহিক ও মানসিক সমস্ত কাজই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করতে হবে। দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভুলে যায় যে, ভগবান হচ্ছেন হৃষীকেশ, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। বহুকাল ধরে তার ইন্দ্রিয়গুলি অপব্যবহারের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার ফলে মানুষ বাস্তবিকপক্ষে অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যায়।

শ্লোক ২৮

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

তত্ত্ববিৎ—তত্ত্বজ্ঞ; **তু**—কিন্তু; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **গুণকর্ম**—প্রকৃতির প্রভাব জনিত কর্ম; **বিভাগয়োঃ**—পার্থক্য; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **গুণেষু**—ইন্দ্রিয়-তর্পণে; **বর্তন্তে**—প্রবৃত্ত হন; **ইতি**—এভাবে; **মত্বা**—মনে করে; **ন**—না; **সজ্জতে**—আসক্ত হন।

গীতার গান

তত্ত্ববিৎ যে বিদ্বান বুঝে গুণকর্ম ।
গুণ দ্বারা কার্য হয় জানে সারমর্ম ॥
অতএব গুণকার্য না করে সজ্জন ।
প্রকৃতির গুণকার্য আসক্ত না হন ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিমুখী কর্ম ও সকাম কর্মের পার্থক্য ভালভাবে অবগত হয়ে, কখনও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগাত্মক কার্যে প্রবৃত্ত হন না।

তাৎপর্য

যিনি তত্ত্ববেত্তা, তিনি পূর্ণ উপলব্ধি করেন যে, জড়া প্রকৃতির সংস্রবে তিনি প্রতিনিয়ত বিব্রত হয়ে আছেন। তিনি জানেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই জড়া প্রকৃতি তার প্রকৃত আলয় নয়। সচ্চিদানন্দময় ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তিনি তাঁর প্রকৃত স্বরূপও জানেন। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, কোন না কোন কারণে তিনি দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর শুদ্ধ স্বরূপে তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস এবং ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সমস্ত কর্ম করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। তাই তিনি কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন এবং তার ফলে স্বভাবতই তিনি আনুষঙ্গিক ও অনিত্য জড় ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি জানেন যে, ভগবানের ইচ্ছার ফলেই তিনি জড় জগতে পতিত হয়েছেন, তাই এই দুঃখময় জড় জগতের কোন দুঃখকেই তিনি দুঃখ বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তিনি তা ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, যিনি ভগবানের তিনটি প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে জানেন, তাঁকে বলা হয় তত্ত্ববিদ্, কারণ ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা তিনি জানেন।

শ্লোক ২৯

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু ।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

প্রকৃতেঃ—জড়া প্রকৃতির; **গুণসংমূঢ়াঃ**—গুণের প্রভাবে বিমূঢ় ব্যক্তিরা; **সজ্জন্তে**—প্রবৃত্ত হয়; **গুণকর্মসু**—প্রাকৃত কার্যকলাপে; **তান্**—সেই সকল; **অকৃৎস্নবিদঃ**—অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে; **মন্দান্**—মন্দবুদ্ধি; **কৃৎস্নবিৎ**—তত্ত্বজ্ঞ; **ন**—না; **বিচালয়েৎ**—বিচলিত করেন।

গীতার গান

গুণকর্মে আসক্তি সে গুণেতে সংমূঢ় ।
প্রাকৃত নিজেকে মানে সেই কার্যে দৃঢ় ॥
ভবরোগী মূঢ় জনে না করি বঞ্চন ।
কর্মের যোজনা হতে ক্রমে জ্ঞান বল ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে, অজ্ঞান ব্যক্তিরা জাগতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তাদের কর্ম নিকৃষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সেই মন্দবুদ্ধি ও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিচলিত করেন না।

তাৎপর্য

যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তারা তাদের জড় সত্তাকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তার ফলে তারা জড় উপাধির দ্বারা ভূষিত হয়। এই দেহটি জড়া প্রকৃতির উপহার। এই জড় দেহের সঙ্গে যারা গভীরভাবে আসক্ত, তাদের বলা হয় *মন্দ,* অর্থাৎ তারা হচ্ছে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান রহিত অলস ব্যক্তি। মূর্খ লোকেরা তাদের জড় দেহটিকে তাদের আত্মা বলে মনে করে; এই দেহটিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাদেরকে তারা আত্মীয় বলে স্বীকার করে, যে দেশে তারা জন্ম নিয়েছে অর্থাৎ যে দেশে তারা তাদের জড় দেহটি প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি তাদের দেশ আর সেই দেশকে তারা পূজা করে এবং তাদের অনুকূলে কতকগুলি সংস্কারের অনুষ্ঠান করাকে তারা ধর্ম বলে মনে করে। সমাজসেবা, জাতীয়তাবাদ, পরমার্থবাদ আদি হচ্ছে এই ধরনের জড় উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের কতকগুলি আদর্শ। এই সমস্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নানা রকম জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকে। তারা মনে করে, ভগবানের কথা হচ্ছে রূপকথা, তাই ভগবানকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তাদের নেই। এই ধরনের মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা অহিংসা-নীতি আদি দেহগত হিতকর কার্যে ব্রতী হয়, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করে যাঁরা তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে জানতে পেরেছেন, তাঁরা এই সমস্ত দেহসর্বস্ব মানুষদের কাজে কোন রকম বাধা দেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা নিঃশব্দে তাঁদের পারমার্থিক কর্ম ভগবানের সেবা করে চলেন।

যারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, তারা ভগবদ্ভক্তির মর্ম বোঝে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তাদের মনে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করার চেষ্টা করে অনর্থক সময় নষ্ট না করতে। কিন্তু ভগবানের ভক্তেরা ভগবানের চাইতেও বেশি কৃপালু, তাই তাঁরা নানা রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করে, সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে, সকলের অন্তরে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। কারণ, তাঁরা জানেন যে, মনুষ্যজন্ম লাভ করে ভগবদ্ভক্তি সাধন না করলে, সেই জন্ম সম্পূর্ণ বৃথা।

শ্লোক ৩০

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

ময়ি—আমাকে; **সর্বাণি**—সর্বপ্রকার; **কর্মাণি**—কর্ম; **সংন্যস্য**—সমর্পণ করে; **অধ্যাত্ম**—আত্মনিষ্ঠ; **চেতসা**—চেতনার দ্বারা; **নিরাশীঃ**—নিষ্কাম; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; **ভূত্বা**—হয়ে; **যুধ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **বিগতজ্বরঃ**—শোকশূন্য হয়ে।

গীতার গান

অতএব তুমি পার্থ ছাড় অভিমান ।
তোমার সমস্ত শক্তি কর মোরে দান ॥
কর্মফল আশা ছাড় নির্মম হইয়া ।
যুদ্ধ কর আশা ত্যজি মূঢ়তা ত্যজিয়া ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! অধ্যাত্মচেতনা-সম্পন্ন হয়ে তোমার সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর এবং মমতাশূন্য, নিষ্কাম ও শোকশূন্য হয়ে তুমি যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতার* উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান আদেশ করছেন যে, সম্পূর্ণভাবে ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। সৈনিকেরা যেমন গভীর নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের কর্তব্যকর্ম করে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ঠিক তেমনভাবে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের আদেশকে কখনও কখনও অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন

করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। তাই, শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল হয়ে তা আমাদের পালন করতেই হবে, কেন না সেটিই হচ্ছে জীবের স্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করে মানুষ যদি সুখী হতে চেষ্টা করে, তবে তার সে চেষ্টা কোন দিনই সফল হবে না। ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করাই হচ্ছে জীবের কর্তব্য এবং সেই জন্য তাকে যদি সব কিছু ত্যাগ করতেও হয়, তবে তা-ই বিধেয়। ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা না করে ভগবানের আদেশ পালন করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ যেন সামরিক নেতার মতোই অর্জুনকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্জুনের পক্ষে সেই নির্দেশ যাচাই করার কোন পথ ছিল না; তাঁকে সেই নির্দেশ মানতেই হয়েছিল। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত আত্মার আত্মা; তাই, নিজের সুখ-সুবিধার কথা বিবেচনা না করে যিনি সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল, অথবা পক্ষান্তরে, যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়, তিনিই হচ্ছেন *অধ্যাত্মচেত*। *নিরাশীঃ* মানে হচ্ছে, ভৃত্য যখন প্রভুর সেবা করে, তখন সে কোন কিছুর আশা করে না। খাজাঞ্চী লক্ষ লক্ষ টাকা গণনা করে, কিন্তু তার এক কপর্দকও সে নিজের বলে মনে করে না, কারণ সে জানে যে, সেই টাকা তার মালিকের। ঠিক তেমনই, এই জগতের সব কিছুই ভগবানের, তাই তাঁর সেবাতে সব কিছু অর্পণ করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি তা করি, তা হলে আমরা ভগবানের যথার্থ ভৃত্য হতে পারি। তা হলেই আমাদের জন্ম সার্থক হয় এবং আমরা পরম শান্তি লাভ করতে পারি। সেটি হচ্ছে *ময়ি* অর্থাৎ 'আমাকে' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য। কেউ যখন এই প্রকার কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে কর্ম করে, তখন নিঃসন্দেহে সে কোন কিছুর উপর মালিকানা দাবি করে না। এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় *নির্মম*, অর্থাৎ 'কোন কিছুই আমার নয়।' ভগবানের এই কঠোর নির্দেশ পালন করতে যদি আমরা অনিচ্ছা প্রকাশ করি—যদি আমরা আমাদের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে ভগবানের নির্দেশকে অবজ্ঞা করি, তবে তা মূঢ়তারই নামান্তর। এই বিকৃত মনোবৃত্তি ত্যাগ করা অবশ্যই কর্তব্য। এভাবেই মানুষ *বিগতজ্বর* অর্থাৎ শোকশূন্য হতে পারে। গুণ ও কর্ম অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিশেষ কর্তব্য আছে এবং কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই কর্তব্য সম্পাদন করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এই ধর্ম আচরণ করার ফলে আমরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৩১

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে—যাঁরা; **মে**—আমার; **মতম্**—নির্দেশাবলী; **ইদম্**—এই; **নিত্যম্**—সর্বদা; **অনুতিষ্ঠন্তি**—নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করেন; **মানবাঃ**—মানুষেরা; **শ্রদ্ধাবন্তঃ**—শ্রদ্ধাবান; **অনসূয়ন্তঃ**—মাৎসর্য রহিত; **মুচ্যন্তে**—মুক্ত হন; **তে**—তাঁরা সকলে; **অপি**—এমন কি; **কর্মভিঃ**—কর্মের বন্ধন থেকে।

গীতার গান

আমার এমত কার্য অনুষ্ঠান করি ।
সর্ব কর্ম করে শুধু ভজিতে শ্রীহরি ॥
শ্রদ্ধাবান মোর ভক্ত অসূয়াবিহীন ।
কর্মফল মুক্ত হয় ভক্তিতে বিলীন ॥

অনুবাদ

আমার নির্দেশ অনুসারে যে-সমস্ত মানুষ তাঁদের কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসর্য রহিত হয়ে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তাঁরাও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে আদেশ করেছেন, তা বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম, তাই সন্দেহাতীতভাবে তা শাশ্বত সত্য। *বেদ* যেমন নিত্য, শাশ্বত, কৃষ্ণভাবনার এই তত্ত্বও তেমন নিত্য, শাশ্বত। ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত না হয়ে এই উপদেশের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। তথাকথিত অনেক দার্শনিক *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাঁরা কোন দিনও *গীতার* মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন না এবং সকাম কর্মের বন্ধন থেকেও মুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু অতি সাধারণ কোন মানুষও যদি ভগবানের শাশ্বত নির্দেশের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান হয়, অথচ সমস্ত নির্দেশগুলিকে যথাযথভাবে পালন করতে অসমর্থ হয়, তবুও সে অবধারিতভাবে কর্মের অনুশাসনের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। ভক্তিযোগ সাধন করার প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ হয়ত ভগবানের নির্দেশ ঠিক ঠিকভাবে পালন নাও করতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে এই পন্থার প্রতি বিরক্ত নয় এবং যদি সে নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা বিবেচনা না করে ঐকান্তিকতার সঙ্গে এই কার্যক্রমের অনুষ্ঠান করতে থাকে, তবে সে নিশ্চিতভাবে ধীরে ধীরে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার পর্যায়ে অবশ্যই উন্নীত হবে।

শ্লোক ৩২

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যে—যারা; **তু**—কিন্তু; **এতৎ**—এই; **অভ্যসূয়ন্তঃ**—মাৎসর্যবশত; **ন**—না; **অনুতিষ্ঠন্তি**—নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করে; **মে**—আমার; **মতম্**—নির্দেশ; **সর্বজ্ঞান**—সর্বপ্রকার জ্ঞানে; **বিমূঢ়ান্**—বিমূঢ়; **তান্**—তাদেরকে, **বিদ্ধি**—জানবে; **নষ্টান্**—বিনষ্ট; **অচেতসঃ**—কৃষ্ণভক্তিহীন।

গীতার গান

প্রকৃতিসদৃশ চেষ্টা করে গুণবান ।
প্রকৃতির বশে সর্ব কার্য অনুষ্ঠান ॥

অনুবাদ

কিন্তু যারা অসূয়াপূর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না, তাদেরকে সমস্ত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, বিমূঢ় এবং পরমার্থ লাভের সকল প্রচেষ্টা থেকে ভ্রষ্ট বলে জানবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় না হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্মকর্তার নির্দেশ মানতে অবাধ্যতা করলে যেমন শাস্তি হয়, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নির্দেশ অমান্য করলেও নিশ্চয়ই শাস্তি আছে। অমান্যকারী লোক, তা সে যতই উচ্চ স্তরের হোক, তার কাণ্ডজ্ঞানহীন বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য, তার নিজের স্বরূপ সম্পর্কে, এমন কি পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কেও সে অজ্ঞ। সুতরাং তার জীবনের পূর্ণতা লাভের কোনই আশা নেই।

শ্লোক ৩৩

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

সদৃশম্—অনুরূপভাবে; **চেষ্টতে**—চেষ্টা করে; **স্বস্যাঃ**—স্বীয়; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতির গুণ; **জ্ঞানবান্**—জ্ঞানবান; **অপি**—যদিও; **প্রকৃতিম্**—স্বভাবকে; **যান্তি**—অনুগমন করেন; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **নিগ্রহঃ**—দমন; **কিম্**—কি; **করিষ্যতি**—করতে পারে।

গীতার গান

বহুকাল হতে যারা প্রকৃতির বশ ।
নিগ্রহ করিতে নারে হইয়া বিবশ ॥

অনুবাদ

জ্ঞানবান ব্যক্তিও তাঁর স্বভাব অনুসারে কার্য করেন, কারণ প্রত্যেকেই ত্রিগুণজাত তাঁর স্বীয় স্বভাবকে অনুগমন করেন। সুতরাং নিগ্রহ করে কি লাভ হবে?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত না হতে পারলে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/১৪) ভগবান সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। তাই, এমন কি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও কেবলমাত্র ধারণাগত জ্ঞান অথবা দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করেও মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। বহু তথাকথিত তত্ত্ববিদ্ আছে, যারা ভগবৎ-তত্ত্বদর্শন লাভ করার অভিনয় করে, কিন্তু অন্তর তাদের সম্পূর্ণভাবে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা সম্পূর্ণভাবে মায়ার গুণের দ্বারা আবদ্ধ। পুঁথিগত বিদ্যায় কেউ খুব পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু বহুকাল ধরে মায়াজালে আবদ্ধ থাকার ফলে সে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। জীব সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে কেবল মাত্র কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে এবং এই কৃষ্ণচেতনা থাকলে সংসার-ধর্ম পালন করেও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই, ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করে হঠাৎ ঘর-বাড়ি ছেড়ে, তথাকথিত যোগী অথবা কৃত্রিম পরমার্থবাদী সেজে বসলে কোনই লাভ হয় না। তার থেকে বরং নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করে কোন তত্ত্ববেত্তার নির্দেশে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এভাবেই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে মানুষ মায়ামুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ৩৪

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়স্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; **ইন্দ্রিয়স্য অর্থে**—ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহে; **রাগ**—আসক্তি; **দ্বেষৌ**—বিদ্বেষ; **ব্যবস্থিতৌ**—বিশেষভাবে অবস্থিত; **তয়োঃ**—তাদের; **ন**—নয়; **বশম্**—বশীভূত; **আগচ্ছেৎ**—হওয়া উচিত ; **তৌ**—তাদের; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—তার; **পরিপন্থিনৌ**—প্রতিবন্ধক।

গীতার গান

অতএব ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ দ্বেষ ছাড়ি ।
বিষয়েতে রাগ দ্বেষ কিছু নাহি করি ॥
তাহার বশেতে নিজে কভু না রহিবা ।
অনাসক্ত বিষয়েতে মাধবের সেবা ॥

অনুবাদ

সমস্ত জীবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে আসক্তি অথবা বিরক্তি অনুভব করে, কিন্তু এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ তা পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক।

তাৎপর্য

যাদের মনে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয়েছে, তাদের আর জড়-জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের বাসনা থাকে না। কিন্তু যাদের চেতনা শুদ্ধ হয়নি, তাদের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা। তা হলেই পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে বিষয়ভোগ করার ফলে মানুষ জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করলে আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ হতে হয় না। যেমন, যোনিসম্ভোগ করার বাসনা প্রতিটি বদ্ধ জীবাত্মার মধ্যেই থাকে, তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিবাহ করে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গ করতে শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং অন্য সমস্ত স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে এই সমস্ত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মানুষ তা অনুসরণ করতে চায় না, ফলে সে জড় বন্ধনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না । এই ধরনের বিকৃত বাসনাগুলি দমন করতে হবে, তা না হলে সেগুলি আত্ম-উপলব্ধির পথে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। জড় দেহটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার প্রয়োজনগুলিও মেটাতে হবে, কিন্তু তা

করতে হবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমে। আর তা সত্ত্বেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোন রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। রাজপথে যেমন দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তেমনই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বহুকাল ধরে এই জড়া প্রকৃতির সংসর্গের ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। তাই, নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করলেও প্রতি পদক্ষেপে অধঃপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয় উপভোগের আসক্তিও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসে তাঁর সেবায় ব্রতী হলে, অচিরেই আমরা জড় সুখভোগ করার বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই, কোন অবস্থাতেই ভগবানের সেবা থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা, তাই কোন অবস্থাতেই তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেষ্ঠ; **স্বধর্মঃ**—স্বধর্ম; **বিগুণঃ**—দোষযুক্ত; **পরধর্মাৎ**—অন্যের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে; **স্বনুষ্ঠিতাৎ**—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত; **স্বধর্মে**—স্বধর্মে; **নিধনম্**—নিধন; **শ্রেয়ঃ**—ভাল; **পরধর্মঃ**—অন্যের ধর্ম; **ভয়াবহঃ**—বিপজ্জনক।

গীতার গান

নিজ ধর্ম শ্রেয় জান পরধর্মাপেক্ষা ।
ভগবদ্ সেবা লাগি কর্মযোগ শিক্ষা ॥
স্বধর্মে নিধন ভাল নহে পরধর্ম ।
ভাল করি বুঝ তুমি এই গূঢ় মর্ম ॥

অনুবাদ

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট। স্বধর্ম সাধনে যদি মৃত্যু হয়, তাও মঙ্গলজনক, কিন্তু অন্যের ধর্মের অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক।

তাৎপর্য

পরধর্ম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, স্বধর্ম আচরণ করাই মানুষের কর্তব্য। জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্মাচরণগুলি মানুষের দেহমনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। সদ্‌গুরু যে আদেশ দেন, তাই হচ্ছে পারমার্থিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করে থাকি। কিন্তু জাগতিক অথবা পারমার্থিক যাই হোক না কেন, অন্যের ধর্ম অনুকরণ অপেক্ষা মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বধর্মে নিষ্ঠাবান থাকা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। জাগতিক স্তরের কর্তব্য এবং পারমার্থিক স্তরের কর্তব্য ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেগুলি সম্পাদন করা সব সময় মঙ্গলজনক। মানুষ যখন জড়া প্রকৃতির দ্বারা কবলিত থাকে, তখন তার কর্তব্য হচ্ছে, তার বিশেষ অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট বিধান পালন করা এবং কোন অবস্থাতেই অপরকে অনুকরণ করা উচিত নয়। যেমন, সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন অহিংসা-পরায়ণ, কিন্তু রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ক্ষত্রিয় প্রয়োজন হলে হিংসার আশ্রয় নিতে পারেন। স্বধর্ম আচরণ করতে গিয়ে ক্ষত্রিয়কে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাও ভাল, কিন্তু ব্রাহ্মণকে অনুকরণ করে অহিংসার আচরণ করা তার উচিত নয়। চিত্তবৃত্তির পরিশোধন করা সকলেরই কর্তব্য, কিন্তু তা সাধন করতে হয় ধীরে ধীরে—তাড়াহুড়ো করে নয়। তবে মানুষ যখন জড় গুণের প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করেন, তখন তিনি যে কোন রকম আচরণ করতে পারেন, কিন্তু তাঁর সেই সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে। কৃষ্ণভাবনার সেই পূর্ণ স্তরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করতে পারেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করতে পারেন। অপ্রাকৃত স্তরে জড় জগতের গুণ অনুসারে স্তর-বিভাগ নেই। যেমন, ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করেছিলেন; আবার ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করেছিলেন। তাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই তাঁরা এভাবে আচরণ করতে পারতেন। কিন্তু মানুষ যখন প্রাকৃত স্তরে থাকে, তখন জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে তাকে তার স্বধর্ম আচরণ করে সম্যক্‌ভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করতে হয়।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **অথ**—তবে; **কেন**—কার দ্বারা; **প্রযুক্তঃ**—প্রেরিত হয়ে; **অয়ম্**—এই; **পাপম্**—পাপ; **চরতি**—আচরণ করে; **পুরুষঃ**—মানুষ; **অনিচ্ছন্**—অনিচ্ছায়; **অপি**—যদিও; **বার্ষ্ণেয়**—হে বৃষ্ণি-বংশাবতংশ; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **ইব**—যেন; **নিয়োজিতঃ**—নিয়োজিত।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে বার্ষ্ণেয় কহ তুমি বুঝাইয়া মোরে ।
কি লাগি হয়েছে জীব যুক্ত পাপ ঘোরে ॥
অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয় পাপে নিয়োজিত ।
অবশ হইয়া করে পাপ সে গর্হিত ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে বার্ষ্ণেয়! মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?

তাৎপর্য

ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ জীব মূলত চিন্ময়, পবিত্র ও সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই, সে জড় জগতের পাপের অধীন নয়। কিন্তু সে যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন সে বিনা দ্বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে নানা রকম পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তাই, এখানে অর্জুন জীবদের এই বিকৃত স্বভাব সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তা খুবই ন্যায়সঙ্গত। যদিও কখনও কখনও জীব পাপকর্ম করতে চায় না, তবুও সে পাপকর্ম করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করে পরমাত্মা কিন্তু আমাদের পাপকর্ম করতে অনুপ্রাণিত করেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তার কারণ ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কামঃ**—কাম; **এষঃ**—এই; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **এষঃ**—এই; **রজোগুণ**—রজোগুণ; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভূত হয়; **মহাশনঃ**—সর্বগ্রাসী; **মহাপাপ্মা**—অত্যন্ত পাপী; **বিদ্ধি**—জানবে; **এনম্**—একে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **বৈরিণম্**—প্রধান শত্রু।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

কাম আর ক্রোধ হয় রজোগুণ দ্বারা ।
অভিভূত বদ্ধজীব ত্রিজগতে সারা ॥
জ্ঞানী জীব এই দুই মহা শত্রু জানে ।
করে তাই গুণাতীত কার্য সাবধানে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন! রজোগুণ থেকে সমুদ্ভত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী ও পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

তাৎপর্য

জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার অন্তরের শাশ্বত কৃষ্ণপ্রেম রজোগুণের প্রভাবে কামে পর্যবসিত হয়। টক তেঁতুলের সংস্পর্শে দুধ যেমন দই হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের প্রতি আমাদের অপ্রাকৃত প্রেম কামে রূপান্তরিত হয়। তারপর, কামের অতৃপ্তির ফলে হৃদয়ে ক্রোধের উদয় হয়; ক্রোধ থেকে মোহ এবং এভাবেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে স্থায়িভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, কাম হচ্ছে জীবের সব চাইতে বড় শত্রু। এই কামই শুদ্ধ জীবাত্মাকে এই জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। ক্রোধ হচ্ছে তমোগুণের প্রকাশ; এভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ আদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয়। তাই, রজোগুণের প্রভাবকে তমোগুণে অধঃপতিত না হতে দিয়ে, যদি ধর্মাচরণ করার মাধ্যমে তাকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করা যায়, তা হলে আমরা পারমার্থিক অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রোধ আদি ষড় রিপুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

ভগবান তাঁর নিত্য-বর্ধমান চিদানন্দের বিলাসের জন্য নিজেকে অসংখ্য মূর্তিতে বিস্তার করেন। জীব হচ্ছে এই চিন্ময় আনন্দের আংশিক প্রকাশ। ভগবান তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবকে আংশিক স্বাধীনতা দান করেছেন, কিন্তু যখন তারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং ভগবানের সেবা না করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে শুরু করে, তখন তারা কামের কবলে পতিত হয়। ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে বদ্ধ জীব তার এই কামোন্মুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পূর্ণ করতে পারে। এভাবে তার সমস্ত কামনা-বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করতে গিয়ে জীব যখন সম্পূর্ণভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ে, তখন সে তার স্বরূপের অন্বেষণ করতে শুরু করে।

এই অন্বেষণ থেকেই *বেদান্ত-সূত্রের* সূচনা, যেখানে বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*—মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমতত্ত্ব অনুসন্ধান করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরম-তত্ত্বকে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চ,* অর্থাৎ "সব কিছুর উৎস হচ্ছেন পরমব্রহ্ম।" সুতরাং কামেরও উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাই, যদি এই কামকে ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত করা যায়, অথবা কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, কিংবা সব কিছু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করা যায়, তা হলে কাম ও ক্রোধ উভয়ই অপ্রাকৃত চিন্ময়রূপ প্রাপ্ত হয়। এভাবেই কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে তুষ্ট করবার জন্য রাবণের স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর ক্রোধকে শত্রুনিধন কার্যে প্রয়োগ করেছিলেন। এখানেও *ভগবদ্গীতায়,* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সমস্ত ক্রোধ শত্রুবাহিনীর উপরে প্রয়োগ করে ভগবানেরই সন্তুষ্টি বিধানের কাজে লাগাতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের কাম ও ক্রোধকে যখন আমরা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করি, তখন তারা আর শত্রু থাকে না, আমাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়।

শ্লোক ৩৮

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

ধূমেন—ধূমের দ্বারা; **আব্রিয়তে**—আবৃত; **বহ্নিঃ**—আগুন; **যথা**—যেমন; **আদর্শঃ**—দর্পণ; **মলেন**—ময়লার দ্বারা; **চ**—ও; **যথা**—যেমন; **উল্বেন**—জরায়ুর দ্বারা; **আবৃতঃ**—আবৃত থাকে; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **তথা**—তেমন; **তেন**—কামের দ্বারা; **ইদম্**—এই; **আবৃতম্**—আবৃত থাকে।

গীতার গান

ত্রিজগতে কাম মাত্র সর্ব আবরণ ।
আগুনেতে ধূম যথা ধূসর দর্শন ॥
অথবা জরায়ু যথা গর্ভ আবরণ ।
অল্পাধিক এই সব কামের কারণ ॥

অনুবাদ

অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্য

জীবের শুদ্ধ চেতনা সাধারণত তিনটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, দর্পণ যেমন ধূলোর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, জীবের শুদ্ধ চেতনাও তেমন কামের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। কামকে যখন ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূম আগুনকে ঢেকে রাখলেও যেমন আগুনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তেমনই কামের অন্তরালে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীবের অন্তরে যখন অল্প-বিস্তর কৃষ্ণভাবনার প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মতো জীবের ভগবদ্ভক্তি কামের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। আগুনের প্রভাবেই ধূমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আগুন জ্বালাবার প্রথম পর্যায়ে আগুনকে দেখা যায় না। তেমনই, কৃষ্ণভাবনার প্রাথমিক পর্যায়েও বিশুদ্ধ, নির্মল ভগবৎ-প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে না। দর্পণের ধূলো পরিষ্কার করার পর যেমন আবার তাতে সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনই, নানা রকম পারমার্থিক প্রচেষ্টার দ্বারা চিত্ত-দর্পণকে মার্জন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করা। গর্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত জরায়ুর সঙ্গে জীবের বদ্ধ অবস্থার তুলনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, এই অবস্থায় জীব কত অসহায়। জঠরস্থ শিশু নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। জীবনের এই অবস্থাকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গাছেরাও জীব, কিন্তু প্রবল কামের বশবর্তী হয়ে পড়ার ফলে তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছে যে, তাদের চেতনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। ধূলোর দ্বারা

আচ্ছাদিত দর্পণকে পশু-পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যায়। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হলে জীব তার সুপ্ত কৃষ্ণচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ধূমাচ্ছাদিত আগুনকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাওয়া দিতে থাকলে, তা যেমন এক সময়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই খুব সন্তর্পণে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ তার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। এভাবেই মনুষ্য-জন্মের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে জীব তার শত্রু কাম প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে আর তা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে।

শ্লোক ৩৯

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

আবৃতম্—আবৃত; **জ্ঞানম্**—শুদ্ধ চেতনা; **এতেন**—এর দ্বারা; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানীর; **নিত্যবৈরিণা**—চিরশত্রুর দ্বারা; **কামরূপেণ**—কামরূপ; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **দুষ্পূরেণ**—অপূরণীয়; **অনলেন**—অগ্নির দ্বারা; **চ**—ও;

গীতার গান

এই নিত্য বৈরী করে জ্ঞান আবরণ ।
জীব তাহে বদ্ধ হয় নহে সাধারণ ॥
কাম হয় দুষ্পূরণ অগ্নির সমান ।
অতএব কাম লাগি হও সাবধান ॥

অনুবাদ

কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত।

তাৎপর্য

মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, ঘি ঢেলে যেমন আগুনকে কখনও নেভানো যায় না, তেমনই কাম উপভোগের দ্বারা কখনই কামের নিবৃত্তি হয় না। জড় জগতে

সমস্ত কিছুর কেন্দ্র হচ্ছে যৌন আকর্ষণ, তাই জড় জগৎকে বলা হয় 'মৈথুনাগার' অথবা যৌন জীবনের শিকল। আমরা দেখেছি, অপরাধ করলে মানুষ কারাগারে আবদ্ধ হয়; তেমনই, যারা ভগবানের আইন অমান্য করে, তারাও যৌন জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই মৈথুনাগারে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে জড় সভ্যতার উন্নতি লাভের অর্থ হচ্ছে, বদ্ধ জীবদের জড় অস্তিত্বের বন্দীদশার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তাই, এই কাম হচ্ছে অজ্ঞানতার প্রতীক, যার দ্বারা জীবদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার সময় সাময়িকভাবে সুখের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই তথাকথিত সুখই হচ্ছে জীবের পরম শত্রু।

শ্লোক ৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়গুলি; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **অস্য**—এই কামের; **অধিষ্ঠানম্**—অধিষ্ঠান; **উচ্যতে**—বলা হয়; **এতৈঃ**—এদের দ্বারা; **বিমোহয়তি**—বিমোহিত হয়; **এষঃ**—এই কাম; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **আবৃত্য**—আবৃত করে; **দেহিনম্**—দেহাভিমানী জীবকে।

গীতার গান

সেই কাম অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়াদি মনে ।
বুদ্ধিতে বসিয়া আঁকে নিখিল ভুবনে ॥
বদ্ধ জীব সে কারণ দেহ অভিমানী ।
স্বাতন্ত্র্যের ব্যবহার নাহি জানে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়সমূহ, মন ও বুদ্ধি এই কামের আশ্রয়স্থল। এই ইন্দ্রিয় আদির দ্বারা কাম জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাকে বিভ্রান্ত করে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবাত্মার দেহের ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশতে শত্রু অধিকার করে বসেছে, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত অংশের কথা ইঙ্গিতে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন,

যাতে আমরা সেই শত্রুকে পরাভূত করতে পারি। ইন্দ্রিয় আদির সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র হচ্ছে মন, তাই মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনার কেন্দ্রস্থল। তাই যখন আমরা ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা শুনি, তখন স্বভাবতই মন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল প্রকার চিন্তাভাবনার আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে; ও তারই ফলে মন ও ইন্দ্রিয়গুলি হয়ে ওঠে কামপ্রবৃত্তির আধার। এর পরে, বুদ্ধি বিভাগটি হয় এই সমস্ত কামপ্রবৃত্তির রাজধানী। বুদ্ধি হচ্ছে আত্মার সব চাইতে অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। এই বুদ্ধি যখন কামের দ্বারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে আত্মাতে অহঙ্কারের সঞ্চার করে, যার ফলে আত্মা জড় ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে জড়ের মাঝে তার স্বরূপ অন্বেষণ করে। জড় ইন্দ্রিয়-সুখকেই প্রকৃত সুখ বলে মনে করে আত্মা তখন তা উপভোগ করতে মত্ত হয়ে ওঠে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৪/১৩) আত্মার এই আত্মবিস্মৃতিকে খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

"যে ত্রিধাতু সমন্বিত এই জড় দেহকে পরম প্রেমাস্পদ আত্মা, স্ত্রী-পুত্রাদিকে আত্মীয়, পার্থিব জন্মস্থানকে পূজনীয় মনে করে এবং তীর্থস্থানে গিয়ে কেবলমাত্র নদীতে স্নান সেরে চলে আসে, কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করে না, সে একটি গাধা অথবা গরু।"

শ্লোক ৪১

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাৎ—সেই হেতু; **ত্বম্**—তুমি; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়গুলি; **আদৌ**—প্রথমে; **নিয়ম্য**—নিয়ন্ত্রিত করে; **ভরতর্ষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ; **পাপ্মানম্**—পাপের প্রধান প্রতীক; **প্রজহি**—বিনাশ কর; **হি**—অবশ্যই; **এনম্**—এই; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—আত্ম-তত্ত্ববিজ্ঞান; **নাশনম্**—নাশক।

গীতার গান

অতএব হে ভারত! প্রথমেতে কাম ।
নিয়মিত করি হও সম্পূর্ণ নিষ্কাম ॥
ভক্তির ধারণ সেই কাম জয় জন্য ।
সে জ্ঞান বিজ্ঞাননাশী, নাহি পথ অন্য ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপের প্রতীকরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

ভগবান প্রথম থেকেই অর্জুনকে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করবার উপদেশ দিয়েছেন যাতে তিনি পরম শত্রু কামকে জয় করতে পারেন, কারণ এই কামের প্রভাবে জীব আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে তার স্বরূপ ভুলে যায়। এখানে জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যে জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা মনে করিয়ে দেয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের আত্মাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—আমাদের জড় দেহটি একটি আবরণ মাত্র। বিজ্ঞান বলতে সেই বিশেষ জ্ঞানকে বোঝায়, যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর ব্যাখ্যা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/৩১) বলা হয়েছে—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥

"আত্মজ্ঞান ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান পরম গোপনীয় ও গভীর রহস্যপূর্ণ, কিন্তু ভগবান যখন নিজে এই জ্ঞান বিশ্লেষণ করেন, তখন তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" *ভগবদ্গীতা* আমাদেরকে আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান প্রদান করে। জীবেরা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই তাদের ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এই উপলব্ধিকে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই, জীবনের শুরু থেকেই আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া, যাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে আমাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি।

প্রতিটি জীবের অন্তরে যে ভগবৎ-প্রেম আছে, তারই বিকৃত প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাম। কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই যদি আমরা ভগবানকে ভালবাসতে শিখি,

তা হলে আমাদের স্বাভাবিক ভগবৎ-প্রেম আর কামে পর্যবসিত হতে পারে না। ভগবৎ-প্রেম কামে বিকৃত হয়ে গেলে, তখন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। তা সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনা এমনই শক্তিশালী যে, এমন কি জীবনের শেষ পর্যায়েও যদি কেউ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে, তবে সে কৃষ্ণপ্রেম ফিরে পায়। তাই, জীবনের যে কোন পর্যায়ে কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন শুরু করা যায়। যখন আমরা কৃষ্ণভাবনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি, ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি, জীবনের যে পর্যায়েই হোক, তখন থেকেই আমরা ভক্তিযোগের অনুশীলন করতে পারি এবং আমাদের পরম শত্রু কামকে কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত করতে পারি। এটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতার স্তর।

শ্লোক ৪২

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সমূহ; **পরাণি**—শ্রেয়; **আহুঃ**—বলা হয়; **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি অপেক্ষা; **পরম্**—শ্রেয়; **মনঃ**—মন; **মনসঃ**—মনের থেকে; **তু**—ও; **পরা**—শ্রেয়; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **যঃ**—যিনি; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির থেকে; **পরতঃ**—শ্রেয়; **তু**—কিন্তু; **সঃ**—তিনি।

গীতার গান

বদ্ধজীব জড়বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রধান ।
ইন্দ্রিয়াধিপতি মন কর্মের বিধান ॥
মন হতে পরবুদ্ধি তারপর আত্মা ।
অতএব কর সেবা সেই পরমাত্মা ॥

অনুবাদ

স্থূল জড় পদার্থ থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়; ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মন শ্রেয়; মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়; আর তিনি (আত্মা) সেই বুদ্ধি থেকেও শ্রেয়।

তাৎপর্য

কামের নানাবিধ কার্যকলাপের নির্গম পথ হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। কামের সঞ্চয় হয় আমাদের দেহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ হয়। তাই, সামগ্রিকভাবে জড় দেহের থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেয়। আমাদের অন্তরে যখন উচ্চস্তরের চেতনার বিকাশ হয় অথবা কৃষ্ণচেতনার বিকাশ হয়, তখন এই সমস্ত নির্গম পথগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অন্তরে কৃষ্ণভাবনার উন্মেষ হলে পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মা তার নিত্য সম্পর্ক অনুভব করে, তাই তখন আর তার জড় দেহের অনুভূতি থাকে না। দেহগত কার্যকলাপগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ, তাই ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হলে, দেহও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু সেই অবস্থায় মন সক্রিয় থাকে, যেমন নিদ্রিত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি। কিন্তু মনেরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে হচ্ছে আত্মা। তাই, আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ঠিক এভাবেই *কঠোপনিষদেও* বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয় উপভোগের সামগ্রীগুলি শ্রেয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় উপভোগের সামগ্রীগুলি থেকে মন শ্রেয়। তাই, মন যদি সর্বতোভাবে নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলির বিপদগামী হবার আর কোন সুযোগ থাকে না। এই মানসিক প্রবৃত্তির কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। মন যদি ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন থাকে, তা হলে নিম্নগামী প্রবৃত্তিগুলিতে আকৃষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তার আর থাকে না। *কঠোপনিষদে* আত্মাকে *মহান্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আত্মা হচ্ছে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। তাই, আত্মার স্বরূপ সরাসরি উপলব্ধি করতে পারলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বুদ্ধি দিয়ে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে, মনকে কৃষ্ণচেতনায় নিযুক্ত করাই সকলের কর্তব্য। তা হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পরমার্থ সাধনে নবীন ভক্তকে সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বিষয় থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়, কেন না তার ফলে ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে সংযত হয়। তা ছাড়া, বুদ্ধি দিয়েও মনকে তার সঙ্কল্পে দৃঢ় করতে হয়। বুদ্ধির দ্বারা যদি আমরা কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে ভগবানের চরণ-কমলে আত্মনিবেদন করি, তা হলে মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে একাগ্র হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনগুলি আর মনকে বিচলিত করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি তখন বিষদাঁতহীন সাপের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মা যদিও বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ না করলে, যে কোন মুহূর্তে মনের প্রভাবে বিচলিত হয়ে আত্মা অধঃপতিত হতে পারে।

শ্লোক ৪৩

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

এবম্—এভাবে; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **পরম্**—পরতর; **বুদ্ধ্বা**—জেনে; **সংস্তভ্য**—স্থির করে; **আত্মানম্**—মনকে; **আত্মনা**—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা; **জহি**—জয় করে; **শত্রুম্**—শত্রুকে; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **কামরূপম্**—কামরূপ; **দুরাসদম্**—দুর্জয়।

গীতার গান

অপ্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা কর দাস্য তার ।
ঘুচিবে সকল মোহ কাম ব্যবহার ॥
সেই সে উপায় এক শত্রু জিনিবার ।
কামরূপ দুরাসদ কেহ নাহি আর ॥

অনুবাদ

হে মহাবীর অর্জুন! নিজেকে জড় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত জেনে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির কর এবং এভাবেই চিৎ-শক্তির দ্বারা কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের স্বরূপ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যকালের দাস, সেই সত্য উপলব্ধি করতে পেরে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে ভগবান বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। জড় জীবনে আমরা স্বাভাবিকভাবে কাম-প্রবৃত্তি ও জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করবার প্রবৃত্তির দ্বারা প্রলোভিত হই। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং জড় ইন্দ্রিয় উপভোগ করার বাসনা হচ্ছে বদ্ধ জীবের পরম শত্রু। কিন্তু কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার ফলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারি। আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে মুহূর্তের মধ্যে সংযত করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ হবার ফলে আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে একাগ্র করতে পারি। এটিই

হচ্ছে এই অধ্যায়ের মর্মার্থ। জড় জীবনের অপরিণত অবস্থায়, নানা রকম দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা এবং তথাকথিত যৌগিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হবার যতই চেষ্টা করি না কেন, পারমার্থিক জীবনধারার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। উন্নত বুদ্ধিযোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করলেই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—কৃষ্ণভাবনাময় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন বিষয়ক 'কর্মযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।